ষড়দর্শন সংগ্রহ।

কলিকাতা

৩৫ নং গুলু ওস্তাগরের লেন,

ভড় কোং দ্বারা

প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।
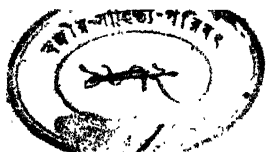
ষড়দর্শন সংগ্রহ।

সাঙ্খ্যদর্শন।

এই দর্শন সেই মহর্ষির কৃত, যিনি শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, যিনি যোগবলে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষের অতিথি করিয়াছেন, এবং যিনি কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী। সেই কপিল নামক মহর্ষি দেখিলেন যে, এই জগন্মণ্ডলে সকলেই ত্রিবিধ তাপে তাপিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, * আধিভৌতিক, † আর আধিদৈবিক ‡ দুঃখে দুঃখিত, এমত কোন সংসারী ব্যক্তি নাই, যে ঐ তাপত্রয়ে তাপিত না হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, অথবা আধিদৈবিক, ইহার অন্যতম

---

* আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ; শারীর আর মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্ম রূপ ধাতু ত্রয়ের বৈষম্য নিমিত্ত জ্বরাদি রোগজন্য যে দুঃখ তাহাকে শারীর; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ ও প্রিয় বস্তুর অদর্শনাদি জন্য যে দুঃখ তাহাকে মানস দুঃখ কহে।

† মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প, বৃশ্চিক ও স্থাবরাদির দ্বারা যে দুঃখ হয় তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে।

‡ যক্ষ রাক্ষস বিনায়ক গ্রহাদির আবেশ নিবন্ধন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে।

দুঃখ সকলেরই আছে। কিন্তু ঐ তাপত্রয় হইতে নিস্তারের উপায় সুচারুরূপে কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। যদিও শ্রুতিতে লিখিত আছে যে তাপত্রয় নিবৃত্তির নানা উপায় নাই, কিন্তু এক মাত্র বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই উহার উপায়, তথাপি ঐ বিবেক যে কি রূপে সম্পাদন করিতে হয় তাহার সবিশেষ বিধান সুচারুরূপে শ্রুতিতে লিখিত নাই; সুতরাং উহা থাকা না থাকা সমান হইয়াছে; এমত ব্যক্তির সংখ্যাও অতি অল্প যাঁহারা শ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া বিবেক সম্পাদন করিতে পারেন। অতএব ঐ বিবেক সম্পাদক কোন সহজ উপায় উদ্ভাবিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া জীবগণের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ পুরঃসর বিবেকোপযোগী ষড়ধ্যায়ী এই সাঙ্খ্য শাস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন, এবং শিষ্য প্রশিষ্যাদি দ্বারা ক্রমশঃ ঐ বিবেক শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও কৃতকার্য্য হইলেন। এজন্য সাঙ্খ্য গ্রন্থ যে কত আছে তাহার সংখ্যা হয় না।

এই দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সঙ্খ্যা অর্থাৎ গণনা করিয়াছেন বলিয়াই ইহাকে সাঙ্খ্য দর্শন কহে। ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এই:—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, আর গন্ধ তন্মাত্র এই পাঁচটী তন্মাত্র, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, আর ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, বায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়েন্দ্রিয় স্বরূপ মন, আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল, ও পৃথিবী এই পাঁচটী মহাভূত, আর পুরুষ। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কেহ কেবল-প্রকৃতি, কেহ কেহ কেবল বিকৃতি,

কেহ কেহ বা প্রকৃতি বিকৃতি উভয়ের স্বরূপ, আর কেহ অনুভয়; মূলপ্রকৃতি মহত্তত্ত্বের কারণ বলিয়া প্রকৃতিস্বরূপ, কিন্তু উহার আর প্রকৃত্যন্তর নাই বলিয়া উহা কেবল প্রকৃতি। মহদাদি পঞ্চতন্মাত্র পর্য্যন্ত সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতি বিকৃতি উভয়াত্মক, কারণ মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি আর অহঙ্কার তত্ত্বের প্রকৃতি। অহঙ্কার তত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি আর পঞ্চ তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি বলিয়া উভয়াত্মক। এবং পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারের বিকৃতি ও পঞ্চমহভূতের প্রকৃতি বলিয়া উহারাও উভয়াত্মক। ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চ মহাভূত ইহারা কোন তত্ত্বান্তরের প্রকৃতি নহে এবং যথাক্রমে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের বিকৃতি এজন্য উহারা কেবল বিকৃতি। আর পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী, ইনি কাহার প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে এজন্য অনুভয় অর্থাৎ না প্রকৃতি না বিকৃতি।

মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত যে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণ তাহাদিগের স্বরূপ, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, অনাশ্রিত, অর্থাৎ কোন আশ্রয় অবলম্বন না করিয়াই অবস্থিত অসংযুক্ত, অবিভক্ত, স্বতন্ত্র, অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্বান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বকার্য্য করণে সমর্থ, অচেতন, জড়াত্মক এবং পরিণামী। মহত্তত্ত্ব অবধি যাবতীয় পদার্থ এই দৃশ্যমান মহতী মহীমণ্ডলি প্রভৃতি মহাভূত পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম্পরায় পরিণামবিশেষ, অর্থাৎ যেমন দধি ও তক্রাদি দুগ্ধের বিকার বিশেষ, সেইরূপ কার্য্যজাত মূল প্রকৃতির বিকার বিশেষ, মূল প্রকৃতিই কার্য্যরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, দধির বিকার নবনীত

নবনীতের বিকার ঘৃত হইলেও দুগ্ধকে দধি ও ঘৃতাদির মূল-কারণ বলা যাইতেছে, সেই রূপ যখন সকল কার্য্যই সাক্ষাৎ পরম্পরায় মূল প্রকৃতির বিকারস্বরূপ হইতেছে তখন মূল প্রকৃতির যে "মূল প্রকৃতি" * এই নামটী যৌগিক হইতেছে ইহা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন। এই প্রকৃতিতত্ত্ব স্বীকার না করিয়া ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ মায়াদ্বারাই জগৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এই রূপ বৈদান্তিকদিগের যে মায়াবাদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে কোন প্রমাণ নাই বরং তদ্বিরোধী ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি

ঈশ্বরের বাক্য।

† "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। মযৈব কথিতং

---

* মূল = আদি, প্রকৃতি = কারণ বিশেষ, মূলপ্রকৃতি = আদ্য কারণ।

† এই সকল বচনের তাৎপর্য্যার্থ এই; মায়াবাদ শাস্ত্রই অসৎ শাস্ত্র এবং বাহ্য আস্তিক শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; (কিন্তু ইহা বাস্তবিক আস্তিকশাস্ত্র নয় নাস্তিক শাস্ত্র)। কলিকালে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমিই এই শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি লোক নিন্দিত কতকগুলি শ্রুতির যথাশ্রুত যে বিরুদ্ধার্থ আছে তাহাই প্রদর্শন করাইয়া কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগের কথা লিখিয়াছি। এবং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ প্রযুক্ত যে নৈকর্ম্ম্য তাহাও লিখিয়াছি। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছি। এবং ব্রহ্মের যথার্থ রূপ যে নির্গুণ তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিযুগে নিখিল জগতের নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি জগতের সংহারের আশয়ে বেদের অযথার্থ অর্থের সহিত মায়াবাদ মহাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। বাস্তবিক ইহা অবৈদিক অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য নহে বেদমূলক মাত্র।

দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং প্রদর্শ্য লোকগর্হিতম্। কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্রচ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্ব-কর্ম্মপরিভ্রংশাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে। পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে ব্রহ্মণোঽস্যপরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যত্র নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং। ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশ-কারণম্" ইতি।

এই সকল বচনকে অপ্রমাণ, বা কল্পিত বলিয়া কি রূপে স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ যদি কল্পিতই হইত, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মমীমাংসার ও সাংখ্য সূত্রাদির ভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রধান বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যে ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিতেন না। যাহা হউক "বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" *। ইত্যাদি প্রাচীন প্রবাদা-নুসারে অস্মদাদির এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই; এই ক্ষণে পুনরায় প্রকৃত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ দ্বারা সকল বিষয়ের প্রকাশ হয়। সত্ত্বগুণের বৃত্তি শান্তা, অর্থাৎ

---

* ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই; বেদ সকল পরস্পর বিভিন্ন, শ্রুতি সকলও বিভিন্ন, এবং তাঁহাকেই মুনি বলা যায় না যাঁহার ভিন্ন নয়। অতএব বেদ, শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি দ্বারা ধর্ম্ম তত্ত্ব নিশ্চয় করা কঠিন, ধর্ম্মতত্ত্ব পর্ব্বতের গুহার ন্যায় নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত আছে। অতএব মহাত্মারা যে পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহাই অবলম্বনীয়।

সত্ত্বগুণ শান্তা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করে। রজোগুণ দুঃখস্বরূপ এবং উপষ্টম্ভক, অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমোগুণ যে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার প্রবর্ত্তক স্বরূপ, যেমন বায়ু নিজে চলিত হইয়া অন্যান্য অচল বস্তুকেও সঞ্চালিত করে, সেইরূপ সত্ত্ব ও তমোগুণ অচলেও রজোগুণদ্বারা চালিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে। রজোগুণের বৃত্তি ঘোরা। তমোগুণ মোহস্বরূপ, গুরু এবং আবরক; দেখ যদি সত্ত্ব ও রজোগুণ দ্বারা আবৃত বা নিয়ন্ত্রিত না থাকিত, তাহা হইলে উহারা সর্ব্বদাই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিত, কখনই উহাদিগের কার্য্যের এরূপ নিয়ম হইত না। কারণ সত্ত্বগুণ রজোগুণদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যে কার্য্য করিবে তাহার নিবারক কে? আর রজোগুণের কথা কি বলিব সে ত স্বভাবতই চঞ্চল। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, উহারা তমোগুণের দ্বারা আবৃত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে বলিয়াই সর্ব্বদা কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু যেমন সিংহ দুর্ব্বলাবস্থায় তৃণশৃঙ্খলকেও ছিন্ন করিতে না পারিয়া অতি নিকটস্থিত জন্তুকেও নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু ঐ সিংহ উদ্রিক্ত হইতে লৌহশৃঙ্খলকেও তৃণ জ্ঞান করিয়া অতি দূরবর্ত্তী ব্যক্তিকেও কাল কবলে নিক্ষেপ করে, সেই রূপ সত্ত্ব ও রজোগুণ অনুদ্রিক্তাবস্থায় তমোগুণদ্বারা আবৃত থাকিলেও উদ্রিক্তাবস্থায় যে তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিবে তাহার বাধা কি? এই রূপে যখন তমোগুণ দ্বারাই কার্য্যের নিয়ম হইতেছে তখন তমোগুণকে নিয়ামক বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। তমোগুণের বৃত্তি মূঢ়া, ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তমোগুণ কার্য্য করে। এই গুণত্রয়ই নিজ নিজ কার্য্য

সম্পাদন কালে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অবলম্বন করে, কেবল এক একটি গুণদ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, ঐ গুণত্রয় যেহেতু পরস্পর বিরোধী অতএব কার্য্যকালে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে কেন, বরং অনিষ্টাচরণ করিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, যেমন পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন সুন্দাসুর ও উপসুন্দাসুর। কিন্তু এ আপত্তি স্থূলদর্শীর নিকটেই রমণীয়, পণ্ডিতের নিকটে উল্লেখ্য নহে, যেহেতু পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বস্তু সকলও পরস্পরের সহকারিতা করে, এবং ঐ সহকারিতায় এক একটী অপূর্ব্ব কার্য্য ও সম্পাদিত হইয়া থাকে; যথা বর্ত্তি ও তৈলের দীপনির্ব্বাণে ক্ষমতা আছে, এবং দীপেরও ঐ উভয়কে ভস্মসাৎ করিবার শক্তি আছে, এজন্য উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু দীপ ঐ উভয়ের সাহায্যেই যাবতীয় দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ করিতেছে; এবং যেমন বাত, পিত্ত ও কফ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও ইহাদিগের পরস্পরের সাহায্যেই শরীর ধারণ হইতেছে, সেইরূপ ঐ গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পুরুষার্থের সম্পাদনার্থ পরস্পর পরস্পরের সহকারিভাবাপন্ন হয়।

আর যখন ঐ গুণত্রয়ের প্রত্যেক দ্বারা কোন কার্য্য হইতেছে না, কিন্তু উহারা একত্রিত হইয়াই নিখিল কার্য্য নিষ্পন্ন করে ইহা স্থির হইল, এবং কার্য্যকারণের অভেদ ও অনন্তর প্রতিপাদিত হইবে, তখন কার্য্য স্বরূপ জগৎ যে ত্রিগুণাত্মক তাহা আর বলা বাহুল্য। আর যেমন নর ও মনুষ্য অভিন্ন বলিয়া নরও যাহাকে বলা যায় মনুষ্যও তাহাকে বলা যায়, সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ যথাক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহস্বরূপ বলিয়া ঐ

ত্রিগুণাত্মক জগৎও সুখ দুঃখ ও মোহস্বরূপ তাহার আর সন্দেহ কি। যদিও যে বস্তু যাহার সুখস্বরূপ হয় সেই বস্তু কখনই তৎকালে তাহার দুঃখস্বরূপ হইতে পারে না বটে, কিন্তু কালান্তরে উহা সেই ব্যক্তির এবং তত্তৎকালেই ব্যক্ত্যন্তরের দুঃখ ও মোহস্বরূপ হইতে পারে; যথা যে রমণী যৎকালে নিজ নায়কের সুখস্বরূপ হইতেছে, সেই রমণীই তৎকালে সপত্নীবর্গের দুঃখ স্বরূপ হইতেছে এবং উদাসীন যুবক পুরুষান্তরের মোহস্বরূপ হইতেছে। অতএব এই রীতিক্রমে বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে সকল বস্তুই সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ।

মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিস্বরূপ। বুদ্ধিতত্ত্বদ্বারাই যাবদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় হয়, ঐ নিশ্চয়কে অধ্যবসায় কহে; অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম। এবং যেমন নীল পীতাদি বর্ণ ঘট পটাদির ধর্ম্ম হইলেও "নীলোঘটঃ পীতোঘটঃ" ইত্যাদি স্থলে ঐ ঐ বর্ণের সহিত ঘট পটাদির অভেদ প্রতীতি ও ব্যবহার হইতেছে, সেইরূপ ধর্ম্ম ধর্ম্মীর অভেদবশতঃ কোন স্থলে বুদ্ধিধর্ম্ম অধ্যবসায়ের সহিতও বুদ্ধির অভেদ বোধ ও ব্যবহার হয়; এজন্য অধ্যবসায় শব্দেও বুদ্ধির নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ঐ বুদ্ধির আরও আটটী ধর্ম্ম আছে, যথা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। তন্মধ্যে আদিম চারিটী সত্ত্বগুণসম্ভূত বলিয়া সাত্ত্বিক, আর অন্তিম চারিটী তামস অর্থাৎ তমোগুণজাত, কিন্তু ঐ উভয় কার্য্যেই রজোগুণের সাহায্য আছে। ধর্ম্ম দুই প্রকার; অভ্যুদয়হেতু ও নিঃশ্রেয়সহেতু। যজ্ঞদানাদিজন্য এবং ঐহিক পারলৌকিক সুখসম্পাদক যে ধর্ম্ম তাহাকে অভ্যুদয়হেতু, আর অষ্টাঙ্গ যোগাদির অনুষ্ঠান জন্য

মুক্তি সাধনী ধর্ম্মকে নিঃশ্রেয়সহেতু ধর্ম্ম কহে। প্রকৃতির সহিত পুরুষের ভেদজ্ঞানকে বিবেক ও তত্ত্বজ্ঞান কহে। রাগের অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের রাগের বিরোধীয় ভাবপদার্থকে বৈরাগ্য কেহ কেহ কেহ অভাবকে বৈরাগ্য কহে*।

অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব ভেদে ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ। অণিমা অণুতা, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মতা; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা শিলামধ্যেও প্রবেশ শক্তি জন্মে। লঘিমা লঘুতা, অর্থাৎ গুরুত্বগুণশূন্যতা; এই ঐশ্বর্য্য থাকিলে এমন লঘু হয় যে, সূর্য্যকিরণকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোক পর্য্যন্তও গমন করিতে পারে। মহিমা মহত্ত্ব, অর্থাৎ অতিস্থূলতা; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা অতি ক্ষীণ ব্যক্তিও প্রকাণ্ড আকার ধারণে সমর্থ হয়। প্রাপ্তি ঐশ্বর্য্য থাকিলে চন্দ্রকেও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করা যায়। প্রাকাম্য ইচ্ছার অনভিঘাত, অর্থাৎ ইচ্ছার অপ্রতিরোধ। যাহার এই ঐশ্বর্য্য আছে, সে যদি ইচ্ছা করে যে "যেমন অন্যান্য জনগণ জলে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করে আমি সেইরূপ ভূমিতেই করিব" তবে তাহাও করিতে পারে। বশিত্ব ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভূত বা ভৌতিক পদার্থ সকলেই বশীভূত হয়। ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভূত ভৌতিক পদার্থ সকলের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারা যায়। সত্য সঙ্কল্পতার নাম কামবসায়িত্ব; এই ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যখন যাহা সংকল্প অর্থাৎ নিশ্চয় করেন, তখন তাহাই সিদ্ধ হয়; তাঁহার নিশ্চয় কখনই ব্যর্থ হয় না; যদি বলেন যে, "এই আম্র-বৃক্ষে নারিকেল ফল ফলিবে, এই আমাবস্যার দিবসে চন্দ্র উদিত

---

* কেহ কেহ রাগের বিরোধী ভাব পদার্থকে অনুরাগ কহে।

হইবেন, এবং এই মৃত ব্যক্তি পুনরায় প্রত্যাগত হইবে" তবে তাহাই ঘটিয়া উঠে।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটী ধর্ম্মের বিপরীত যথাক্রমে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই চারিটী বুদ্ধির ধর্ম্ম। অভিমানকে অহঙ্কার কহে। ঐ অবস্থার দ্বারাই "আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমা হইতে ধনী বা বিদ্বান্ পৃথিবীতে কেহ নাই, আমাকে সকলেই মান্য করে" ইত্যাদি অভিমান হইয়া থাকে, এজন্য অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম্ম, ইহাতেই অভিমান ও অহঙ্কারের অভিন্নরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে যেমন নীল বর্ণের সহিত ঘটাদির। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র অতি সূক্ষ্ম ও অবিশেষ পদবাচ্য, এবং দেবতা ও যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষের বিষয়, অস্মদাদির ইন্দ্রিয়গোচর নহে। নয়নাদির ত্বক্ পর্য্যন্ত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়; এবং বাগাদি উপস্থ পর্য্যন্ত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রির দ্বারা অনুক্রমে বাক্য প্রয়োগ, বস্তুর গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ অর্থাৎ পুরীষত্যাগ ও আনন্দ অর্থাৎ রমণসুখ নিষ্পন্ন হয়। এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেই মনের সহকারিতা আছে, এজন্য মনকে উভয়েন্দ্রিয় কহে। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ ইহারা শরীরের অন্তরে থাকে, এজন্য ইহাদিগকে অন্তঃকরণ কহে। আর নয়নাদি উপস্থ পর্য্যন্ত দশটী ইন্দ্রিয় শরীরের বহিঃস্থিত বলিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় এবং বাহ্যকরণ পদবাচ্য। অন্তঃকরণ তিন ও বাহ্যকরণ দশ; এইরূপে করণ সমুদায়ে ত্রয়োদশটী, এ কারণ কিংবদন্তী আছে যে, করণ ত্রয়োদশ প্রকার।

পঞ্চভূত স্থূল, অস্মদাদিরও প্রত্যক্ষের বিষয়, এবং বিশেষ

পদবাচ্য। ঐ পঞ্চভূত ত্রিবিধ; শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। যাহারা সত্ত্বপ্রধান তাহারা শান্ত, সুখস্বরূপ, প্রসন্ন এবং লঘু। যাহারা রজোগুণপ্রধান, তাহারা ঘোর, ও দুঃখাত্মক। চঞ্চল, আর যাহারা তমোগুণপ্রধান, তাহারা মূঢ়, মোহস্বরূপ, গুরু এবং বিষণ্ণ। বুদ্ধি অবধি মহাভূত পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বই অনিত্য, অব্যাপক সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, সংযোগী, বিভক্ত, পরতন্ত্র, এবং ব্যক্তপদবাচ্য।

পুরুষ নিত্য, সত্ত্বাদিত্রিগুণশূন্য, চেতন স্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা. বিবেকী, সুখদুঃখাদিশূন্য, মধ্যস্থ ও উদাসীনপদবাচ্য; ইনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্য্যই করেন না, সকলই প্রকৃতির কার্য্য; তবে যে "আমি করিতেছি আমি সুখী বা দুঃখী" ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে সে ভ্রমমাত্র। বস্তুতঃ সুখ, দুঃখ বা কর্তৃত্ব আমার নাই, সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম; দেখ, কখন পরমসুখজনক সামগ্রী সমবধানেও সুখ হয় না কখন বা অতি সামান্য বিষয়েও পরম সুখ লাভ হয়; আর কাহার রাজ্য লাভে এবং পালঙ্কে শয়নেও সুখ বোধ হয় না, কেহ বা ভিক্ষা লাভে ও ছিন্নমন্দোলীতে শয়ন করিয়াও পরম আনন্দ ভোগ করে অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, সুখকর বা দুঃখকর কিছুই অনুগত নাই, যখন, যে বস্তুকে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহা দ্বারা যথাক্রমে সুখ বা দুঃখ হইয়া উঠে; অতএব সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম।

পুরুষ শরীর ভেদে নানা, অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ এক একটী পুরুষ আছেন। যদি সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা পুরুষ এক হইত, তাহা হইলে একের জন্ম

বা মরণে সকলেরই জন্ম বা মরণ হইত, এবং একের সুখ বা দুঃখে জগন্মণ্ডল সুখী বা দুঃখী হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন সুখ দুঃখের এরূপ নিয়ম রহিয়াছে তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পুরুষ নানা, এবং যে পুরুষ যে রূপ কার্য্য করে তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। যদিও আত্মার সুখ বা দুঃখাদি কিছুই নাই ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হওয়াতে "এক জনের সুখে জগৎ সুখী না হয় কেন?" এরূপ আপত্তি উত্থাপিতই হইতে পারে না, তথাপি যেমন "জবাপুষ্প সন্নিধানে অতি শুভ্র স্ফটিকও রক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধিস্থ সুখ দুঃখাদিকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া "আমি সুখী আমি দুঃখী" এইরূপ বোধ হয়, সকল ব্যক্তির ঐকাত্ম্যপক্ষে একজনের ঐ রূপ বোধ হইলে সকলের না হয় কেন" এরূপ আপত্তির খণ্ডন হয় না। এবং "আমি ভোজন করিতেছি" ইত্যাদি যে ব্যবহার হইতেছে তাহা শরীরের ক্রিয়া লইয়াই সমর্থন করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়া বা কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই।

ঐ শরীর দ্বিবিধ; স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর মাতা পিতার দ্বারা সম্পন্ন হয়; মাতা হইতে লোম, রক্ত ও মাংস হয়, পিতা হইতে স্নায়ু, * অস্থি ও মজ্জা জন্মে। এই ছয়টী বস্তু ঘটিত বলিয়া স্থূল শরীরকে ষাট্‌কৌশিক, এবং উক্ত রীতিক্রমে মাতা পিতা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে মাতাপিতৃজ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এই শরীরেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়;

---

* মেদঃ।

এই শরীরই অন্তে হয় মৃত্তিকা, না হয় ভস্ম অথবা শৃগাল কুক্কুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবেক, যিনি যত যত্ন করুন না কেন, কেহই এই শরীরকে অজরামর করিতে পারিবেন না; সকলই কিছু দিনের নিমিত্ত, অন্তে আর দ্বিতীয় পথ নাই; পৃথিবীশ্বরেরও যে গতি দরিদ্রেরও সেই গতি।

সূক্ষ্ম শরীর, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ, ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ তত্ত্বের সমষ্টি। ইহা নিত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, এবং অব্যাহত, অর্থাৎ অপ্রতিহতগতি। সূক্ষ্ম শরীর শিলামধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহলোক পরলোক গামী, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর কখন নর, পশু, পক্ষী শিলা ও বৃক্ষাদি স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে, এবং কখন স্বর্গীয়, কখন বা নারকীয় স্থূল শরীর, আর কখন পুনর্ব্বার মনুষ্যাদি শরীর গ্রহণ করে। এই শরীরেরই সুখ দুঃখ ভোগ হয়, এই শরীরের বিনাশ হয় না। প্রকৃতি সর্গের আদিতে এক একটী পুরুষের এক একটী সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম শরীর অধুনা আর জন্মে না। সকল পুরুষই জীবাত্মা, জীবাত্মাতিরিক্ত পরম পুরুষ পরমেশ্বরে কোন প্রমাণ নাই, ইহা স্বয়ং কপিলদেবই "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, আর এবিষয়ে ষড়্দর্শনটীকাকার পণ্ডিত প্রধান বাচস্পতিমিশ্রও তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে যুক্তি দিয়াছেন এবং ঈশ্বর সাধক যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন; এ বিষয়ের প্রতিপোষণার্থ দর্শনসংগ্রহকারও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নানা যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঐ সমস্ত পরে লিখিত হইতেছে। কিন্তু সাঙ্খ্য প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কহেন যে, কপিলদেবের মতেও ঈশ্বর আছেন,

তবে যে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রে রচনা করিয়াছেন সে কেবল বাদীকে জয় করিবার আশয়ে প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। অতএব "ঈশ্বরাভাবাৎ" এরূপ সূত্র রচনা না করিয়া "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, কপিলদেব বাদীকে কহিতেছেন, তুমি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে পারিলে না এইমাত্র; ফলতঃ ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বর নাই ইহা কপিলদেবের অভিপ্রেত নহে।

"যেমন ঘট পটাদি জড়াত্মক বস্তু কোন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয় না, কিন্তু যখন সচেতন বস্তু অধিষ্ঠাতা হইয়া উহাদিগের আনয়নাদি করে, তখনই ঐ ঘট পটাদি স্বকার্য্য জলাহরণাদিতে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও জড়াত্মক, সুতরাং কিরূপে তিনি কোন সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত বা শক্ত হইবেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃতিরও একজন সচেতন ব্যক্তি অধিষ্ঠাতা আছেন; কিন্তু জীবাত্মাকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু জীবগণ স্থূলদর্শী ও অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি দোষে দূষিত; জীবের এমন কি শক্তি আছে যে জগৎ করণে প্রবৃত্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে, সুতরাং তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তরাত্মা পরমেশ্বরের সত্তাস্বীকার করিতে হইবেক। তিনিই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা" এই যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করা যেমন "কাকে তোমার কর্ণ লইয়া গেল" এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র নিজ কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়াই কাকের প্রতিধাবন করা উপহাসনীয় হয়। কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় বস্তুর

কার্য্য করিতে পারে না ইহাই আদৌ অসিদ্ধ, যে হেতু চেতনাধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও অনেক জড় বস্তুর কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, যথা অভিনবজাত কুমারের বৃদ্ধি ও জীবনধারণার্থ জড়াত্মক দুগ্ধ * প্রবৃত্ত হইতেছে এবং জনগণের উপকারার্থ সময়ে সময়ে অতি জড় যে মেঘ সেও বর্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব জীবের কৈবল্যার্থে জড়াত্মক প্রকৃতিও জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন কি।

আর ঈশ্বর সংস্থাপনের আশয়ে "ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত করেন, বা স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয়েন" এই কথা বলা, যেমন তপনজনিত সন্তাপ শান্তির আশয়ে প্রজ্বলিত জ্বলনের সেবন করা সন্তাপ নিবর্ত্তক না হইয়া সমধিক সন্তাপের নিমিত্তই হইয়া উঠে, সেইরূপ (বিবেচনা করিয়া দেখিলে) ঈশ্বরসাধক না হইয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বাদির ব্যাঘাতকই হইয়া উঠে। দেখ, করুণাশব্দে পরের দুঃখ নিবারণেচ্ছা বুঝায়। সুতরাং "ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া সৃষ্টি করেন" ইহার অর্থ এই হইল, পরমেশ্বর জীবের দুঃখ নিবারণেচ্ছায় সৃষ্টি করেন; কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহারও দুঃখ ছিল না। দুঃখও পরমেশ্বর সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহা প্রতিবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন; তবে ঈশ্বর প্রথমতঃ কাহার নিবারণাশয়ে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, আর কিহেতুই বা সর্ব্বজ্ঞ পর-

---

* এস্থলে কেহ বলেন দুগ্ধ বহির্নিগমে প্রবৃত্ত হয়, আর কেহ কহেন উহা নিজ অঙ্গে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বালকের নিমিত্তই জন্মে।

রোগের এইরূপ অসৎ দুঃখের নিবারণে ইচ্ছা হইল? যদি রোগ থাকে, তবেই তন্নিবারণার্থে ঔষধ সেবন করিতে হয়, নতুবা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়াও ঔষধ সেবনে ইচ্ছা করে? বরং তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে দ্বেষই প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যেমন সুস্থ ব্যক্তির ঔষধ সেবনে রোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বলিয়া যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক বলিয়া থাকে, সেইরূপ যদি ঈশ্বর জীবগণের দুঃখ না থাকাতেও তন্নিবারণে সমুৎসুক হইয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন যে, ঈশ্বর অজ্ঞ ও অবিবেচকের ন্যায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও বিবেচকতাদি ঈশ্বরত্ব শক্তিই বা আর কোথায় রহিল; ঈশ্বর অস্মাদাদি অপেক্ষাও অজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত জীবে দুঃখ সঞ্চারের পর পরমেশ্বর করুণা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এই কথা বলাও অজ্ঞান জলধির তরঙ্গস্বরূপ বলিতে হইবে, যেহেতু তাহা হইলে "জীবগণের দুঃখের আবির্ভাব হইলে ঈশ্বর তন্নিবারণের আশয়ে সৃষ্টি করেন, এজন্য সৃষ্টি দুঃখকে অপেক্ষা করিতেছে, এবং সৃষ্টি হইলে দুঃখের আবির্ভাব হয় এজন্য দুঃখও সৃষ্টিসাপেক্ষ।" এই পরস্পর সাপেক্ষতারূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। আরও দেখ, যদি পরমেশ্বর করুণা করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে কখন কেহ সুখী বা দুঃখী হইত না, যেহেতু সকলেই পরমেশ্বরের কৃপার পাত্র এবং পরমেশ্বর পক্ষপাতাদি দোষ শূন্য। অতএব সিদ্ধ হইল য, পরমেশ্বর নাই কেবল অচেতন প্রকৃতিই জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

আর যেমন নির্ব্ব্যাপার অয়স্কান্ত মণির সন্নিধানে জড়াত্মক লৌহেরও ক্রিয়া হইতেছে, সেইরূপ জীবাত্মক পুরুষ সন্নিধানে জড় স্বরূপ প্রকৃতিরও জগন্নির্ম্মাণার্থ ক্রিয়া হওয়া অসম্ভাবিত নহে। এবং যেরূপ স্বামিকর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা স্ত্রী আর স্বামীর নিকটে যায় না তাহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিপুরুষকর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা প্রকৃতি তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন আর তাঁহার সংসার সৃষ্টি করেন না। অথবা যেমন নর্ত্তকী নৃত্যদর্শনরূপ স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে সংসাররূপ রঙ্গ দর্শাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। আর যথা কেবল পঙ্গু বা কেবল অন্ধ ব্যক্তি অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারে না কিন্তু যদি অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে স্বকীয় স্কন্ধে আরোহণ পুরঃসর তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে, তবে উভয়েই অভিলষিতসম্পাদনে সমর্থ হয় এজন্য ঐ উভয় পরস্পর সাপেক্ষ; সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে (অর্থাৎ পুরুষকর্ত্তৃক অভেদে দৃষ্ট হইয়াই) তাহার সংসার সৃষ্টি করেন এজন্য প্রকৃতি পুরুষসাপেক্ষ, আর পুরুষও প্রকৃতিগত সুখ দুঃখকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া তন্নিবারণাভিলাষে মুক্তি প্রার্থনা করেন। ঐ মুক্তি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্যতাখ্যাতি (অর্থাৎ ভেদজ্ঞান স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান) ব্যতিরেকে জন্মে না, সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়, প্রকৃতি ব্যতীত সম্ভবে না এজন্য পুরুষও প্রকৃতি সাপেক্ষ। অতএব সিদ্ধ হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ।

প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। এই মতে সকল কার্য্যই সৎ অর্থাৎ সকল কার্য্যই উৎপত্তির পূর্ব্বে স্ব স্ব কারণে,

সূক্ষ্ম রূপে সংযুক্ত থাকে, পরে যখন আবির্ভূত হয় তখন তাহাকে উৎপন্ন কহে, আর যখন তিরোভূত হয় অর্থাৎ পুনরায় নিজ কারণে বিলীন হয় তখন তাহাকে বিনষ্ট কহে। বস্তুতঃ কোন কার্য্য উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না। দেখ, তিলের, ধান্যের ও স্ত্রীস্তনের অন্তরে যথাক্রমে তৈল, তণ্ডুল ও দুগ্ধ সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু যখন অনুক্রমে তাহাদিগের পীড়ন, অবঘাত ও দোহন করা যায়, তখনই তৈল, তণ্ডুল ও দুগ্ধ উৎপন্ন হইল, এরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, নতুবা পূর্ব্বে কেহ ঐরূপ ব্যবহার করে না। কিন্তু, যেমন কূর্ম্মের অঙ্গ যখন বহির্নিঃসৃত হয় তখনই আবির্ভূত হইল, আর যখন অন্তর্নিবিষ্ট হয় তখনই তিরোভূত হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ যখন কারণ হইতে কার্য্য বহির্নিঃসৃত হয় তখনই আবির্ভূত ও উৎপন্ন হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে; আর যখন কারণে প্রবেশ করে তখন তিরোভূত ও বিনষ্ট হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এতম্মতাবলম্বীরা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতসিদ্ধ অসৎ বস্তুর উৎপত্তি ও সৎ বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন না। কারণ যদি কার্য্য সকল পূর্ব্বে অসৎ থাকে, তবে তাহাকে পরে সৎ করা কাহার সাধ্য? এক বস্তুর পূর্ব্বে যেরূপ স্বভাব থাকে পরেও সেইরূপ স্বভাব থাকে কখনই স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয়না; দেখ, অদ্যাপি এমন ব্যক্তি দৃষ্ট বা শ্রুতিগোচর হয়েন না যিনি নীল বস্তুকে পীত বা মনুষ্যকে গো, স্ত্রীকে পুরুষ বন্ধ্যা পুত্রউৎপাদন করিতে পারেন। আরও দেখ, যখন কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন হইতেছে, তখন কারণকে সৎ, কার্য্যকে অসৎ বলা কিরূপে সম্ভবে। এ স্থলে আপাততঃ এরূপ

আপত্তি হইতে পারে "যদি কার্য্য কারণের ভেদ না থাকে তবে তন্তুর কার্য্য পটদ্বারা যেরূপ আবরণাদি হইতেছে, তন্তু দ্বারা সেরূপ না হয় কেন?" কিন্তু এ আপত্তি কোনক্রমেই বিচার গ্রাহ্য হইতে পারে না। দেখ, যেমন একজন বাহক দ্বারা শিবিকা বহন হয় না এবং এক মুষ্টি তৃণ দ্বারা অবিরত বিগলিত বারিধারা নিবারিত হয় না, কিন্তু যথাক্রমে বাহক ও তৃণমুষ্টি সমূহ যথানিয়মে একত্রিত হইলে অনায়াসেই ঐ ঐ কার্য্য সম্পাদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক তন্তু দ্বারা আবরণাদি কার্য্য না হইলেও তাদৃশ বিলক্ষণ সংস্থান দ্বারা পটভাবাপন্ন তন্তু সমূহ দ্বারা আবরণাদি কার্য্য হইবার বাধা কি? এবং পট রূপে অপরিণত তন্তু দ্বারাই বা আবরণাদি হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার করিলে কোন হানি নাই, বরঞ্চ ভেদ স্বীকার করিলে অনেক দোষ ঘটে। দেখ, যে বস্তু যে বস্তু হইতে ভিন্ন হয়, সে বস্তুর সহিত সে বস্তুর, হয় সংযোগ, না হয় অপ্রাপ্তি থাকে; যেমন পর্ব্বতের সহিত বহ্নির ও বস্ত্রের সহিত শরীরাদির সংযোগ আছে, এবং হিমগিরির সহিত বিন্ধ্যগিরির অপ্রাপ্তি রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রতিবাদী মহাশয়েরা পটের সহিত তন্তুর সংযোগ বা অপ্রাপ্তি কিছুই স্বীকার করিবেন না, অথচ পটের সহিত তন্তুর ভেদ স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, কার্য্য কারণের ভেদ পক্ষে এক প্রবল দোষ আছে; দেখ, বিভিন্ন বস্তুর গুরুত্বাদি গুণ বিভিন্ন এবং ঐ ঐ গুণের কার্য্যও বিভিন্ন, আর বিভিন্ন বস্তুদ্বয় একত্রিত হইলে ঐ উভয়ের দ্বিগুণ গুরুত্ব নিবন্ধন, গুরুত্বের কার্য্যও দ্বিগুণ হয়। যথা, একপক্ষিক

স্বস্তিকের গুরুত্ব নিবন্ধন, তুলাদণ্ডের যাদৃশ অবনতি হয় দ্বিপলিক স্বস্তিকের বা এক পলিক স্বস্তিকদ্বয়ের গুরুত্বদ্বারা তত্তোধিক অবনতি হয় ইহা বালকেরও অবিদিত নহে। সুতরাং কার্য্য কারণের বিভিন্নরূপতা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য্যের গুরুত্ব হইতে কারণের গুরুত্ব ভিন্ন, এবং ঐ ঐ গুরুত্বদ্বয়ের কার্য্যও ভিন্ন, আর কার্য্য কারণ একত্র হইলে ঐ উভয়ের দ্বিগুণ গুরুত্বের কার্য্যও দ্বিগুণ হয়। কিন্তু ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের কোন উপকার নাই, স্বর্ণকারাদিরই অধিক লাভের সম্ভাবনা; কারণ একপলিক স্বস্তিকের সহিত তোলিত করিয়া যে স্বর্ণ স্বর্ণকার হস্তে সমর্পণ করা যায়, সেই স্বর্ণই অলঙ্কার হইলে দ্বিপলিক স্বস্তিকের সমতুল হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু ঐ এক পলিক স্বর্ণের গুরুত্ব, আর তৎকার্য্য অলঙ্কারের গুরুত্ব উভয়ে মিলিয়া দ্বিপলিক স্বস্তিকের গুরুত্ব সদৃশ হইতেছে, সুতরাং স্বর্ণকারদিগের এক মুদ্রায় এক মুদ্রা লাভের সম্ভাবনা, ইহাতেই বোধ হয়, স্বর্ণকারের প্রতি করুণা করিয়া অথবা তদ্দত্ত তৈলবট গ্রহণের আশয়ে নৈয়ায়িক মহাশয়েরা কার্য্য কারণের ভেদ ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন, নতুবা তাদৃশ সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাশয়দিগের ভ্রম হইয়াছে এ কথা কে বলিবে। ফলতঃ কার্য্য যে অসৎ নয় ইহা ভগবদ্গীতাতেই লিখিত আছে, যথা * "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইতি।

---

* অসৎ বস্তুর কখনই উৎপত্তি হয় না। আর সদ্বস্তুর কখন অভাব হয় না।

এইরূপে যখন স্থির হইল যে, কার্য্য সৎ এবং ঐ কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ স্বরূপ নিজ কারণে সূক্ষ্ম রূপে থাকে, তজ্জন্য "অসৎ কারণ হইতে সৎস্বরূপ কার্য্য হয়" এই সৌগতদিগের সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও অগ্রাহ্য তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। আরও দেখ, অসৎ বস্তু কখনই কারণ হইতে পারে না, অদ্যাপি কোন স্থলে কোন ব্যক্তি কখন দেখেন নাই, বা শ্রবণ করেন নাই যে, বন্ধ্যার পুত্র কোন কার্য্য করিতেছে, এবং শশশৃঙ্গ দ্বারা কোন অনিষ্ট হইল। কিন্তু এজন্য বৈদান্তিকেরা যে কহেন "যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয় সেইরূপ সচ্চিদানন্দ পরাৎপর ব্রহ্মে এই জগতের ভ্রম হইতেছে. বাস্তবিক জগৎ সৎ নহে," ইহাও অনুচিত ও অশ্রোতব্য. কারণ রজ্জুতে সর্পের জ্ঞানকে যে ভ্রম বলা যায় তাহার কারণ বাধদর্শন, সেইরূপ সৎকার্য্য বিষয়ে কোন বাধক দেখিতেছি না, তবে ভ্রম বলিয়া ভ্রান্ত হইব কেন? আরও দেখ, সদৃশ বস্তুতেই সদৃশ বস্তুর ভ্রম হইয়া থাকে নতুবা বিসদৃশ বস্তুতে বিসদৃশ বস্তুব ভ্রম কাহারও কখন হয় না, রৌপ্যে কখনই স্বর্ণের ভ্রম হয় না। সুতরাং জড়াত্মক জগতের ভ্রম কি রূপে অতি স্বচ্ছ সচ্চিদানন্দে সম্ভবে? অতএব প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করা কেবল নাস্তিকতা প্রকাশ মাত্র সন্দেহ নাই।

সৃষ্টির প্রক্রিয়া এইরূপ, প্রথমতঃ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হয়, সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত ঐ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়, রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে, এবং

পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত জন্মে। তাহারও প্রণালী এইরূপ, শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ তন্মাত্র ও স্পর্শ তন্মাত্র এই উভয় হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। ঐ দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে তেজঃ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। ঐ তিন তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে জল হয়, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, আর রস। ঐ চারিটী তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চ মহাভূত হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন ও তদন্তর্বর্ত্তী কার্য্যজাত হয়।

পাতঞ্জল দর্শন।

এই দর্শন ভগবান্ পতঞ্জলি মুনির প্রণীত বলিয়া পাতঞ্জল শব্দে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ইহাতে যোগের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাকে যোগশাস্ত্রশব্দে, এবং পদার্থ নির্ণয়াংশে সাঙ্খ্যদর্শনের সহিত ঐকমত্য থাকায়, অর্থাৎ মতভেদ না থাকায় সাঙ্খ্য-প্রবচন শব্দেও নির্দ্দেশ করা যায়। সাঙ্খ্যমতপ্রদর্শক কপিলমুনি, যে রূপ প্রকৃতি ও মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব মহর্ষি পতঞ্জলিরও অভিমত কিন্তু কপিল মতে জীবাতিরিক্ত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্,

লোকাতীত পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকৃত হয় নাই *। ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈশ্বরসত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ কারণই কপিলদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনকে যথাক্রমে নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাঙ্খ্য দর্শন কহে। পাতঞ্জল দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। প্রথম পাদে যোগশাস্ত্র করিবার প্রতিজ্ঞা যোগের লক্ষণ, যোগের অসাধারণ উপায়স্বরূপ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য তাহাদিগের স্বরূপ ও ভেদ, সম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি-বিভাগ, সবিস্তার যোগোপায়, ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ, উপাসনা ও তৎফল, চিত্তবিক্ষেপ, দুঃখাদি, চিত্তবিক্ষেপের ও দুঃখাদির নিরাকরণোপায়, এবং সমাধি প্রভেদ প্রভৃতি বিষয় সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ সকলের নির্দ্দেশ, স্বরূপ, কারণ ও ফল, কর্ম্মের প্রভেদ, কারণ, স্বরূপ ও ফল, বিপাকের কারণ ও স্বরূপ, তত্ত্বজ্ঞান রূপ বিবেক খ্যাতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গভেদে কারণ যে যম নিয়মাদি তাহাদিগের স্বরূপ ও ফল, এবং আসনাদির লক্ষণ,

---

* কপিলকৃত সাঙ্খ্যসূত্রের সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, সাঙ্খ্যমতেও ঈশ্বরসত্তা স্বীকৃত আছে; কিন্তু ষড়্দর্শনটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন যে, সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বর নাই। এবং মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে কপিলকৃত সাঙ্খ্যদর্শনকে নিরীশ্বর সাঙ্খ্যদর্শনশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া জানাইয়াছেন যে কপিলমতে ঈশ্বর নাই। বস্তুতঃ "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই কপিলসূত্র সন্দর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বর নাই। অতএব আমরা এস্থলে কপিলমতে ঈশ্বর নাই লিখিলাম।

কারণ ও ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়ে যোগের অন্তরঙ্গ স্বরূপ যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তাহাদিগের স্বরূপ, পরিণাম ও প্রভেদ, এবং বিভূতিপদবাচ্য সিদ্ধি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থপাদে সিদ্ধিপঞ্চক, বিজ্ঞানবাদনিরাকরণ, সাকারবাদসংস্থাপন, এবং কৈবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ চারিটী পাদ যথাক্রমে যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ শব্দে বুঝিতে হইবেক।

পতঞ্জলি মতে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বেই যাবতীয় পদার্থ অন্তর্ভূত হইবেক, এতদতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সাঙ্খ্যদর্শনসংগ্রহে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে এস্থলে পুনরুক্তিভয়ে পরিত্যক্ত হইল। ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব পরমেশ্বর। পরমেশ্বর স্বীকারের যুক্তি এই; সাতিশয় অর্থাৎ তারতম্যরূপে অবস্থিত বস্তু সকলের শেষ সীমা আছে, যথা অল্পত্ব ও অধিকত্ব পরিমাণের শেষ সীমা যথাক্রমে পরমাণু ও আকাশ। অতএব যখন কাহাকে ব্যাকরণশাস্ত্রে, কাহাকে কাব্য ও অলঙ্কারে, আর কাহাকে বা ঐ ঐ শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞানাদিও সাতিশয় পদার্থ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক জ্ঞানাদিও কুত্রাপি শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয়তা পদে পদার্পণ করিয়াছে। যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সদ্ভাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ গুণবত্তারূপ অত্যুৎকৃষ্টতাকে নিরতিশয়তা কহে। অণুর পরম অণুতা, স্থূলের পরম স্থূলতা, মূর্খের অত্যন্ত মূর্খতা,

বিদ্যানের সকল বিদ্যাবত্তাই অত্যুৎকৃষ্টতা বলিতে হইবে, নতুবা তদ্বিপরীত স্থূলতাদি অণু প্রভৃতির উৎকৃষ্টতা হইবে না। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিবেচনা করিতে হইলে অধিক বিষয়কতা ও অল্পবিষয়কতাই লক্ষিত হইবেক; এ কারণই কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানীকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী, আর অধিক শাস্ত্রজ্ঞানীকে উৎকৃষ্টজ্ঞানী কহে। এইরূপে যখন অধিক বিষয়কতাই জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ইহা সিদ্ধ হইল, তখন এই অপরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মাণ্ডস্থ খেচর, অরণ্যচর ও অস্মদাদির চক্ষুর অগোচর সর্ব্ববস্তুবিষয়কতাই যে জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্টতারূপ নিত্য নিরতিশয়তা তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? ঐ নিত্য নিরতিশয়জ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা জীবের সম্ভবে না; যেহেতু জীবনের বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণদ্বারা কলুষিত থাকায় দৃকশক্তি পরিচ্ছিন্ন দৃকশক্তিদ্বারা কখনই সর্ব্বগোচর জ্ঞান সম্ভবে না, সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন দৃকশক্তিমান্‌কেই তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতার এক মাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক সন্দেহ নাই। ঐ অপরিচ্ছিন্ন দৃকশক্তিমান্ যিনি তিনিই অস্মদাদির অভিমত পরমেশ্বর; তদ্ভিন্ন অন্যকে আমরাও পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করি নাই। এইরূপে যখন পরমেশ্বরসত্তা সিদ্ধ হইল, তখন পরমেশ্বর নাই বলিয়া বাগাড়ম্বর করা কেবল অজ্ঞানবিজৃম্ভিত মাত্র সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর বক্ষ্যমাণ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাকাশয়াদি রহিত, জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ পূর্ব্বক সংসারপ্রবর্ত্তক, সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি সকলের অনুগ্রাহক, অসীমকৃপানিধান, এবং অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। আর পরমেশ্বর যোগপরতন্ত্র অর্থাৎ

যথানিয়মে যোগানুষ্ঠান করিলে অভীষ্টফলপ্রদ ও সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ হয়েন।

চিত্তবৃত্তির নিরোধকে, অর্থাৎ বিষয় সুখে প্রবৃত্ত চিত্তকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও ধ্যেয়বস্তুমাত্রে সংস্থাপিত করিয়া তন্মাত্রের ধ্যান বিশেষকে যোগ কহে। অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর নিরুদ্ধ ভেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়া সুখ দুঃখাদি জনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। দৈত্যদানবাদির চিত্ত প্রায় ঐ অবস্থাতে থাকে। যে অবস্থায় তমোগুণের উদ্রিক্ততা নিবন্ধন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিচারমূঢ় হইয়া ক্রোধাদিবশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে। ঐ মূঢ়াবস্থান্বিত চিত্ত রক্ষঃপিশাচাদির স্বভাবসিদ্ধ। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ঐ কালে চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা জন্মে; দেবতাদিগের চিত্ত প্রায় বিক্ষিপ্তাবস্থা পরিত্যাগ করে না। এই তিন অবস্থাই যোগের প্রতিকূল, অর্থাৎ এই তিন অবস্থাতে কখনই যোগসাধন হয় না। সত্ত্বগুণে বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও নিরুদ্ধ অবস্থা জন্মে। এই দুই অবস্থাই যোগের অনুকূল; এ অবস্থাদ্বয় না হইলে কখনই যোগ সিদ্ধ হয় না।

চিত্তের অবস্থা বিশেষকে চিত্তবৃত্তি কহে। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার; প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, আর স্মৃতি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, অর্থাৎ শব্দ ভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ। মিথ্যা-জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানকে বিপর্য্যয় কহে; যেমন রজ্জুকে সর্প ও

শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া জানা। কোন বিষয় বাস্তবিক অত্যন্ত অসম্ভাবিত বলিয়া স্থির থাকিলেও তদর্থপ্রতিপাদক শব্দ শ্রবণ মাত্র আপাততঃ তদ্বিষয়ের যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে বিকল্প কহে। মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় হওয়া অলীক বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলেও যদি কেহ কহে যে, মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় হইয়াছে দর্শন কর, তবে সকলেরই তৎক্ষণাৎ ঐ শব্দের প্রয়োগবশতঃ ঐ অসম্ভাবিত অর্থের বোধ হইবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা ঐ শব্দ শ্রবণমাত্র ঐ অসঙ্গত অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিরূঢ় না হইলে ঐ শব্দপ্রয়োক্তা ব্যক্তি বুদ্ধিমৎসমাজে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণিত হইত না। পশুপক্ষি প্রভৃতি জন্তুদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি ঐ ঐ জন্তুদিগকে অসংলগ্নবাদী বলিয়া থাকে? তাহার কারণ কেবল ঐ ঐ জন্তুদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্থ বোধের অভাব। এইরূপে যখন সিদ্ধ হইতেছে, অর্থ সঙ্গতই হউক বা অসঙ্গতই হউক, শব্দশ্রবণমাত্রেই তদর্থের বোধস্বরূপ শব্দবোধ হয়, তখন নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিক প্রভৃতি মহোদয়গণের "অসঙ্গত অর্থ বোধক শব্দের অর্থবোধ স্বরূপ শাব্দবোধ হয় না" এই সিদ্ধান্ত প্রবাহে পতিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আরও দেখ শব্দশ্রবণাধীন অসঙ্গতার্থের বোধ স্বীকার না করিলে ঐ ঐ মহোদয়দিগের অধুনা সম্মান সংবর্দ্ধনের অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ বিচারও হইতে পারে না; কারণ যদি প্রতিবাদী সঙ্গতার্থ শব্দ প্রয়োগ করে, তবে তাহার প্রতি দোষোদ্ভাবন করা হয় না; আর যদি অসঙ্গতার্থ শব্দ প্রয়োগ করে, তাহা হইলে ঐ ঐ মতে তাহার অর্থবোধই হয় না, সুতরাং বিচার কালে উক্ত মহাশয়দিগকে উভয়থাই মৌনাবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের

বিষয় এই যে, উক্ত মহাশয়েরাই বিচারকালে প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অধিক বাগাড়ম্বর করেন। এই এই স্থলে শব্দবোধের শব্দ বোধান্তরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করা ঔদ্ধত্যমদে মত্ত হইয়া অকৃতাপরাধী চিরপ্রতিপালক প্রভুর সম্পদে অপরিচিত ব্যক্তির অভিষেক করিতে বাঞ্ছা করার ন্যায় নিতান্ত গর্হিত বিশেষতঃ পণ্ডিতগণের কদাচ কর্ত্তব্য নয়। আরও বিবেচনা কর, ঐ ঐ মহোদয়দিগের যদি নিতান্ত শব্দবোধের প্রতি বিদ্বেষ এবং বোধান্তরের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই শব্দবোধ পরিত্যাগ করিয়া বোধান্তরের শরণ লওয়া উচিত, নতুবা পতি ও উপপতি উভয়েরই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী রমণীর বৃত্তি অবলম্বন করা কি পণ্ডিতের পক্ষে প্রশংসা করা হইতেছে? অতএব নব্য ন্যায়গ্রন্থকারক কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী মহাশয়েরা গড্ডলিকাপ্রবাহে পতিত না হইয়া অসংগতার্থেরও শাব্দবোধ স্বীকার করিয়াছেন। নিদ্রা শব্দে প্রসিদ্ধ নিদ্রাকে বুঝিতে হইবেক। ফলতঃ যৎকালে তমোগুণের অত্যন্ত উদ্রেক হয় তৎকালে নিদ্রা জন্মে। এবং স্মরণকে স্মৃতি কহে। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তিই চিত্তের পরিণামবিশেষ বলিয়া চিত্তের ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে; যেহেতু আত্মা অপরিণামী, কূটস্থ ও নিত্য। আত্মা ও পরমেশ্বরভিন্ন সকল বস্তুই পরিণামী, কোন বস্তুই পরিণামবিনির্মুখে ক্ষণকালও থাকে না, সকল বস্তুরই সর্ব্বদা পরিণাম হইতেছে।

পরিণাম ত্রিবিধ; ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা। মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদির যথাক্রমে ঘট সরাবাদি ও কটক কুণ্ডলাদিকে ধর্ম্ম পরিণাম, ঐ ঐ ধর্ম্মের বর্ত্তমানত্ব ও ভূতত্বাদিকে লক্ষণ পরিণাম, আর

ধর্ম্মিস্বরূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্বাদিকে অবস্থাপরিণাম কহে। যোগস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। বহুকাল নিরন্তর আদরাতিশয় সহকারে কোন বিষয়ে যত্ন করাকে অভ্যাস, আর বিষয়সুখবিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য কহে। যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সে বিবেচনা করে, সুখদুঃখজনক বিষয়ের বশীভূত আমি নই, আমারই বশবর্ত্তী সুখদুঃখাদিজনক বিষয়; এ কারণ বৈরাগ্যকে বশীকারশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। বিষয় দ্বিবিধ; দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক। ইহলোকে উপভুজ্যমান বিষয়কে দৃষ্ট, আর পরলোকে ভোক্তব্য বিষয়কে আনুশ্রবিক কহে। ইহার উদাহরণ যথাক্রমে বনিতা, স্রক্ ও চন্দনাদি, এবং স্বর্গ নরকাদি। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, আর অনবস্থিতত্ব এই কয়েকটী যোগের প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ ইহারা রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাদুর্ভাবে উৎপন্ন হইয়া চিত্ত বিক্ষেপ সম্পাদন দ্বারা একাগ্রতার প্রতিরোধ করে। ধাতু বৈষম্য নিমিত্ত জ্বরাদিকে ব্যাধি, অকর্ম্মণ্যতাকে স্ত্যান, "যোগ করা যায় কি না" ইত্যাদি সন্দেহকে সংশয়, অনবধানতাকে প্রমাদ, যোগসাধনে ঔদাসীন্যকে আলস্য, যোগে প্রবৃত্ত্যভাবের হেতুভূত চিত্তের গুরুত্বকে অবিরতি, যোগাঙ্গ ভ্রান্তকে ভ্রান্তি দর্শন, সমাধি ভূমির অপ্রাপ্তিকে অলব্ধভূমিকত্ব, এবং সমাধিতে চিত্তের অস্থৈর্য্যকে অনবস্থিতত্ব কহে। এই কয়েক কারণ বশতঃ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাসাদি জন্মে। চিত্তের রজোংশের পরিণামবিশেষকে দুঃখ কহে। দুঃখ প্রতিকূল বেদনীয়, কেহই দুঃখকে অনুকূল

বিবেচনা করে না। বাহ্য বা আন্তরিক কোন কারণ বশতঃ চিত্তের ঔদাসীন্যকে দৌর্মনস্য, সর্ব্বাঙ্গ কম্পকে অঙ্গমেজয়ত্ব, প্রাণ বায়ুর বহির্দেশ হইতে অন্তঃপ্রবেশকে শ্বাস, আর অন্তর হইতে বহির্দেশ গমনকে প্রশ্বাস কহে। দুঃখাদি কয়েকটী দোষ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে পুনরায় চিত্তের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে পুনরায় যোগ করণে সমর্থ হয়। চিত্তপ্রসাদজনক উপায় অনেক আছে; তন্মধ্যে কয়েকটী প্রদর্শিত হইতেছে। চিত্তশুদ্ধিসমুৎসুক ব্যক্তি সকলের কর্ত্তব্য, সাধুব্যক্তির সুখসন্দর্শন করিয়া ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করেন, এবং দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ পরিহারের চেষ্টা করে না। দুঃখী ব্যক্তির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা অতি অকর্ত্তব্য। পুণ্যবানের পুণ্য প্রশংসা করিয়া হৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার প্রতি বিদ্বেষ করা অনুচিত। পাপী ব্যক্তির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে তদ্বিষয়ে অনুমোদন বা বিদ্বেষ কিছুই করিবে না। এই কয়েকটী কর্ম্মকে পরিকর্ম্ম কহে।

যোগ দ্বিবিধ; জ্ঞানযোগ আর ক্রিয়াযোগ। পূর্ব্বোক্ত যোগকে জ্ঞানযোগ কহে। জ্ঞানযোগের অধিকারী সকলে নহে; যাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাদিগেরই জ্ঞান-যোগে অধিকার আছে। যাহাদিগের চিত্তপ্রসাদ না হইয়াছে তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ করিতে হয়। ক্রিয়াযোগ তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান ভেদে তিন প্রকার। বিধি প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরশোধনকে তপস্যা কহে। প্রণব ও গায়ত্রী প্রভৃতি

মন্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় কহে। ঐ মন্ত্র দ্বিবিধ; বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক মন্ত্রও দ্বিবিধ; প্রগীত আর অপ্রগীত সামবেদীয় মন্ত্রকে প্রগীত কহে,যে হেতু সামমন্ত্রের গান করিতে হয়। অপ্রগীত ও দ্বিবিধ; ঋক্ ও যজুর্ম্মন্ত্র। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রকে তান্ত্রিক মন্ত্র কহে। তান্ত্রিক মন্ত্র স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক ভেদে ত্রিবিধ। যে মন্ত্রের অন্তে "নমঃ" এই শব্দ আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র, আর যাহার অন্তে "বহ্নিজায়া" অর্থাৎ স্বাহা এই শব্দ আছে, তাহাকে স্ত্রী মন্ত্র কহে; এতদতিরিক্ত সকল মন্ত্রই পুরুষমন্ত্র। পুরুষ মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র, অর্থাৎ অন্যান্য মন্ত্র সকলের সংস্কার না করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু পুরুষ-মন্ত্রের সংস্কার হউক বা না হউক, ঐমন্ত্র যদথে অনুষ্ঠিত হইবে সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পুরুষ মন্ত্র বশীকরণাদি কর্ম্মে অতিপ্রশস্ত।

মন্ত্রের সংস্কার দশ প্রকার, জনন, জীবন তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি মাতৃকাবর্ণ, অর্থাৎ স্বর ও হলবর্ণ, হইতে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রের উদ্ধারকে জনন, মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণ সকলকে প্রণবযুক্ত করিয়া জপ করাকে জীবন, মন্ত্রঘটক বর্ণ সকলকে লিখিয়া চন্দনযুক্ত জল দ্বারা বায়ু বীজ * উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক বর্ণের তাড়নাকে তাড়ন, ঐরূপ মন্ত্রবর্ণকে লিখিয়া করবীর পুষ্প দ্বারা প্রতি বর্ণের প্রহারকে বোধন, স্বকীয় তন্ত্রানুসারে অশ্বত্থপত্রের দ্বারা মন্ত্রের অভিষেককে অভিষেক, মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া জ্যোতির্ম্মন্ত্র দ্বারা মলত্রয়ের দাহ করাকে বিমলীকরণ, মন্ত্রপূত কুশোদক দ্বারা

* অর্থাৎ যং।

বারিবীজ * উচ্চারণ করিয়া বিধিবৎ মন্ত্রের প্রোক্ষণকে আপ্যায়ন, মন্ত্রে মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তর্পণকে তর্পণ, তার † মায়া, ‡ রমা, § বীজাদির যোগ করাকে দীপন, এবং জপ্য মন্ত্রের অপ্রকাশনকে গোপন কহে। এই দশ বিধ সংস্কার করিলে মন্ত্রের রুদ্ধ, কীলিত, বিচ্ছিন্ন, সুপ্ত ও শপ্তাদি দোষ থাকে না, এ কারণ মন্ত্রজপের পূর্ব্বে এই দশবিধ সংস্কার করা অতি আবশ্যক এবং প্রকৃতকলোপযোগী। জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম সকলের ফলাভিসন্ধি ব্যতিরেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে ঈশ্বর প্রণিধান কহে। এই ঈশ্বরপ্রণি-ধানকেই ক্রিয়াফল সন্ন্যাস কহে। ফলাভিসন্ধি ব্যতিরেকে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন; ফলাভি-সন্ধান করিয়া কর্ম্ম করিলে কখনই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন না। ইহা পণ্ডিত প্রধান নীলকণ্ঠ ভারতী স্পষ্ট লিখিয়াছেন, যথা "যে কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিতে আরব্ধ করা যায়, সে কর্ম্ম অতি প্রযত্ন সহকারে সম্পন্ন করিলেও তাহাতে ঈশ্বরের তুষ্টি জন্মে না, সে কর্ম্ম কুক্কুর কর্ত্তৃক অবলীঢ় পায়সাদির সদৃশ।"

উল্লিখিত ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিলে ক্লেশ সকলের তনুতা অর্থাৎ ক্ষীণতা জন্মে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ভেদে ক্লেশ পঞ্চবিধ। অবিদ্যা শব্দে অজ্ঞান স্বরূপ মোহকে বুঝায়। অতথাভূত বস্তুকে তথাভূত

* "বং" এই বীজকে বারিবীজ কহে।

† ওঁ।

‡ অর্থাৎ হ্রীং।

§ শ্রীং।

করিয়া জানাকে অজ্ঞান কহে। এই অবিদ্যাই অন্যান্য ক্লেশের মূলীভূত, সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলেই অন্যান্য ক্লেশও নিবৃত্ত হয়, এবং অবিদ্যা প্রবৃত্ত হইলেই সকল ক্লেশ প্রবৃত্ত হয়। আত্মার সহিত অন্তঃকরণের অভেদজ্ঞানকে অস্মিতা কহে। এই অস্মিতা বশতই নির্লেপ আত্মাকে ও "অহং কর্ত্তা" ইত্যাদি কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানে লিপ্ত করে। সুখকর বিষয়ে অভিলোকব রাগ কহে; এই রাগবশতঃ সকলে সংসারে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখজনক বিষয়ে যে বিদ্বেষ ভাব তাহাকে দ্বেষ কহে; এই দ্বেষরূপ দোষ থাকাতেই আপাততঃ ক্লেশকর যোগাদিতে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ প্রবৃত্ত হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত যে অসহ্য মরণদুঃখ, তদ্বাসনা বশতঃ; অর্থাৎ তাহার স্মরণ বশতঃ ইহ জন্মে যে মরণ ভয় উপস্থিত হয় তাহাকে অভিনিবেশ কহে। এই অপরিচ্ছিন্ন ধরামণ্ডলে সচেতন পদার্থ মাত্রেরই অন্তঃকরণে অভিনিবেশ সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে।

এই পঞ্চবিধ ক্লেশ কর্ম্ম, বিপাক ও কর্ম্মাশয়ের মূলীভূত। বৈধ ও অবৈধ ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। বৈধকর্ম্ম বেদ বোধিত যজ্ঞাদি, আর অবৈধ কর্ম্ম বেদ নিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি। কর্ম্ম-ফলকে বিপাক কহে। বিপাক জাতি, আয়ুঃ ও ভোগভেদে তিন প্রকার। জাতি দেবত্ব মনুষ্যত্বাদি। আয়ুঃ চিরজীবিত্ব অল্পজীবিত্বাদি। ভোগসাধন ও ভোগ্য ভেদেও দ্বিবিধ। ভোগসাধন ইন্দ্রিয়াদি, ভোগ্য সুখ-দুঃখ-জনক বিষয়জাত। সংসাররূপে অবস্থিত যে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম তাহাকেই কর্ম্মাশয় কহে। কর্ম্মাশয় পুণ্য ও পাপভেদে দ্বিবিধ। সংসার রূপে অবস্থিত কর্ম্মকে পুণ্য, আর বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মকে পাপ কহে।

ঐ উভয় কর্ম্মাশয়ও দ্বিবিধ; দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয়। ইহ জন্মে যে পুণ্য বা পাপ স্বরূপ কর্ম্মাশয়ের ভোগ হয় তাহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয়, এবং জন্মান্তরে যাহার ভোগ হয় তাহাকে অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয় কহে। যদি অতিশয় যত্ন ও বিশেষ নিয়ম সহকারে নিরন্তর বহুকাল দেবতার আরাধনাদি করা যায়, অথবা ব্রহ্মবধাদি নিন্দনীয় কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে ইহ জন্মেই ঐ ঐ কর্ম্মের ফল ভোগ হয় সন্দেহ নাই; যেমন মহাদেবের আরাধনা করাতে নন্দীশ্বরের বিপিষ্ট জন্মাদি এবং তপোবলে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্তিরূপ শুভ কর্ম্মের ফল ইহজন্মেই ঘটিয়াছে, এবং কুকর্ম্ম বশতঃ নহুশ ও উর্ব্বশীর যথাক্রমে জাত্যন্তর ও কার্ত্তিকেয়বনে লতারূপে অবস্থান ঘটীয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মফলস্বরূপ বিপাক যদিও পুণ্য পাপ জন্য বটে, তথাপি উহারা পরম্পরায় পুণ্য ও পাপের জনকও হয়। দেখ যাঁহারা পুণ্যবলে যে জাতি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা সেই জাতিতে কেবল পুণ্যই করেন, যেমন যোগীকুলজাত মহাপুরুষগণ; আর যাহারা পাপবলে যে জাতি প্রাপ্ত হয় তাহারা সেই জাতিতে নিরন্তর পাপানুষ্ঠানই করে, যথা ব্যাধকুলজাত পামরগণ। ফলতঃ সকলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মবলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পর পর জন্মের কারণীভূত কর্ম্ম করে সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগীদিগের পক্ষে সেরূপ নহে। যোগীরা অত্যন্ত সুখজনক বিষয়কেও বিষসম্পৃক্ত সুস্বাদু মিষ্টান্নের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করেন, এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম অপরিহার্য্য বিবেচনায় তাহারই ফল ভোগে সন্তুষ্ট হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করেন, কখনই পুনর্জন্মকারণীভূত কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, কর্ম্মের মধ্যে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক ও চিত্তশুদ্ধিকর যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

যোগাঙ্গ অষ্টবিধ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ ভেদে যম পাঁচ প্রকার। প্রাণিবিনাশন স্বরূপ হিংসা পরিত্যাগকে অহিংসা কহে। এই অহিংসাকে যে সিদ্ধ করিতে পারে তাহার নিকটে স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী জন্তু সকলও বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করে। এ কারণ যে বনে যোগীরা বাস করেন, তথায় অহি, নকুল, মৃগ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি চিরবৈরাবলম্বী পশু সকলও সহজ সুহৃদের ন্যায় একত্র বিচরণ করে। বাক্য ও মনে মিথ্যাশূন্যতাকে সত্য কহে। সত্যসিদ্ধ ব্যক্তি যাহাকে যাহা বলেন, অবিলম্বে তাহার সে বিষয় সিদ্ধ হয়। সত্যাবলম্বীর কথা কখনই মিথ্যা হয় না; যদি কহেন "এই বন্ধ্যার পুত্র হইবে, অথবা অদ্য মধ্যাহ্নে বা অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদিত হইবেন" তবে ঐ ঐ বিষয়ও সিদ্ধ হয়। পরদ্রব্য অপহরণ স্বরূপ চৌর্য্যের অভাবকে অস্তেয় কহে। অস্তেয়ের অনুষ্ঠান করিলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না; অমূল্য রত্নাদিও সন্নিধানে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়-দোষশূন্যতাকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। ব্রহ্মচর্য্য করিলে অপ্রতিহত-বীর্য্য অর্থাৎ অসাধারণ সামর্থ জন্মে। ভোগসাধন বিষয়ের অস্বীকারকে অপরিগ্রহ কহে। অপরিগ্রহের অনুষ্ঠান করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথারূঢ় হয়। এই অহিংসাদি পাঁচটী কার্য্য যদি জাতি দেশ,কাল আর সময়কে অপেক্ষা

না করিয়াই অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ইহাদিগকেই মহাব্রত কহে। "ইনি ব্রাহ্মণ ইঁহাকে বধ করা হইবে না" "গঙ্গাতীরে কি রূপে বধ করিব" "পুণ্যাহ চতুর্দ্দশী তিথিতে বধ করা অতি অনুচিত" যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ব্যতিরেকেও পরহিংসা করে সে অতিনৃশংস ও পামর" এই কয়েক প্রকার বিবেচনা করিয়া ঐ ঐ স্থলে অহিংসাদির অনুষ্ঠানকে যথাক্রমে জাতি, দেশ, কাল ও সময়কে অপেক্ষা করিয়া অহিংসানুষ্ঠান কহে। কিন্তু যোগীরা এরূপ জাত্যাদি অপেক্ষা না করিয়া অহিংসাদির অনুষ্ঠান করেন, একারণ উহাদিগের অহিংসাদিগকে মহাব্রত বলা যায়। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, আর ঈশ্বর প্রণিধান ভেদে নিয়মও পাঁচ প্রকার। বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরমলের প্রক্ষালনকে বাহ্য শৌচ, আর মিত্রতাদি দ্বারা মনোমল প্রক্ষালনকে অভ্যন্তর শৌচ কহে। সকল বিষয়ে তুষ্টিকে সন্তোষ কহে। তপস্যাদি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

উল্লিখিত যম নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে বিতর্কাদি বিনষ্ট হয়। বিতর্ক শব্দে হিংসাদি পাপ কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ঐ বিতর্ক ত্রিবিধ; কৃত, কারিত ও অনুমোদিত। স্বয়ং সম্পাদিত বিতর্ককে কৃত, আর অন্যকে নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা সম্পাদিতকে কারিত বিতর্ক কহে; এবং অন্যকৃত বিতর্কে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং তদ্বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর সম্মত হইলে উহাকে অনুমোদিত বিতর্ক বলা যায়। এস্থলে যখন কারিত ও অনুমোদিত বিতর্ক কৃত বিতর্কের সহিত তুল্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন "আমি স্বয়ং হিংসা করি না তবে ঐ ব্যক্তিকৃত

হিংসা বিষয়ে, আমার সম্মতি বা ইচ্ছা ছিল এই মাত্র, অতএব আমার এ বিষয়ে পাপ হইতে পারে না” এইরূপ যুক্তিতে যে কারিত ও অনুমোদিত দুষ্কর্ম্মের পাপজনকতা খণ্ডন, সে কেবল খণ্ডজ্ঞানীর দুরাগ্রহমাত্র সন্দেহ নাই। যেরূপ যমস্বরূপ যোগাঙ্গের অন্তর্গত অহিংসাদির এক একটী অবান্তর ফল প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের অন্তর্গত শৌচাদিরও এক একটী আন্তরীয় ফল আছে। যথা শৌচানুষ্ঠান করিলে শরীরের কারণকলাপ অনুসন্ধান করিয়া শরীরে অপবিত্রতা জ্ঞান এবং নিজ শরীরের প্রতি ঘৃণা জন্মে; ঐ ঘৃণার ফল এই যে “যখন শরীর অপবিত্র হইতেছে তখন তাহার প্রতি আস্থা বা যত্ন করা অবিধেয়” এইরূপ বিবেক উপস্থিত হইয়া নিজ শরীরের প্রতিও আগ্রহ নিবারণ করিয়া এবং তাদৃশ অপবিত্র শরীরশালী ব্যক্তি সকলের সংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়া যোগীর অসঙ্গত্ব সম্পাদন করে। শৌচ দ্বারা পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিবেকখ্যাতিও জন্মে। তাহার প্রণালী এইরূপ, শৌচ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সৌমনস্য অর্থাৎ মনপ্রসন্নতা, সৌমনস্য দ্বারা একাগ্রতা, একাগ্রতা দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়, ইন্দ্রিয় জয় হইলেই উল্লিখিত বিবেকখ্যাতি সম্পাদনে সামর্থ জন্মে।

সন্তোষের অভ্যাস দ্বারা এক অনির্ব্বচনীয় মানসিক সুখ আবির্ভূত হয়। সমুদায় বিষয় সুখ ঐ সুখের শতাংশের একাংশও হইবে না। তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও কায়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়। ঐ অশুদ্ধি নির্মূল হইলে ইন্দ্রিয় ও কায়ের এক অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে। তদ্দ্বারা অতি সূক্ষ্ম, অত্যন্ত ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী বস্তু সকলও দর্শনপথে অধিরূঢ় হয় এবং স্বেচ্ছানুসারে

কখন বা অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করিতে পারা যায়। উল্লিখিত স্বাধ্যায় অনুষ্ঠিত হইলে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর প্রণিধান করিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া আন্তরিক ক্লেশকলাপের বিলয় করিয়া সমাধি সম্পাদনে সামর্থ প্রদান করেন। ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা যেরূপ সমাধি সামর্থ্য জন্মে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাও সেইরূপ জন্মে, বিশেষতঃ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা আশু বিবেক খ্যাতি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ঈশ্বরের উপাসনা শব্দে ঈশ্বর বাচক প্রণব- তৎ এবং সৎ, ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ এবং ঐ ঐ শব্দের অর্থ যে ঈশ্বর তাঁহার নিরন্তর স্মরণ বুঝিতে হইবেক। শাস্ত্রানুসারে স্থান বিশেষে হস্তপদাদির সংস্থাপন পূর্ব্বক উপবেশনকে আসন কহে। আসন দশ বিধ পদ্মাসন, ভদ্রাসন, বীরাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডকাসন, সোপাশ্রয়, পর্য্যাঙ্ক, ক্রৌঞ্চ, নিষদন, উষ্ট্রনিষদন আর সমসংস্থাপন। ঐ ঐ আসনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি নিরূপণ করিয়াছেন। আসনের অনুষ্ঠানে এক চমৎকার স্থির সুখের অনুভব হয়।

প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক গতি বিচ্ছেদকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম ত্রিবিধ; রেচক, পূরক ও কুম্ভক। অন্তর হইতে যথাশাস্ত্র প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসারণকে রেচক, বহির্দেশ হইতে অন্তরে আনয়নকে পূরক, এবং অন্তঃস্থিতবৃত্তিকে অর্থাৎ নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া কেবল অন্তরে ধারণকে কুম্ভক স্বরূপ চরম প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানকালে প্রাণবায়ু চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চলবৃত্তি অবলম্বন করে; এইরূপে কুম্ভক প্রাণায়ামের কুম্ভের সহিত দৃষ্টান্ত ঘটে বলিয়া ইহাকে কুম্ভক

প্রাণায়াম বলা যায়। প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তের মলক্ষয় হয় এবং ধারণার অনুষ্ঠানে শক্তি জন্মে। যেরূপ মধুমক্ষিকা সকল মধুকরণার অনুষ্ঠানে শক্তি জন্মে। সেরূপ মধুমক্ষিকা সকল মধুকররাজের অনুবর্ত্তী হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ অবিকৃতস্বরূপ চিত্তের অনুবর্ত্তন করে। ঐ অনুবর্ত্তনকে প্রত্যাহার কহে। ঐ প্রত্যাহারের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া বশতাপন্ন হয়. যদি কখন বিষয়াভিমুখে ধীয়মান হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনুরক্ত হয় না। নাভিচক্র বা নাসিকা-প্রদেশে বিষয়ান্তর হইতে বিনিবৃত্ত চিত্তের স্থিরীকরণকে ধারণা কহে। অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধ্যেয় বস্তুর চিন্তা প্রবাহকে ধ্যান কহে। ঐ ধ্যানই পরিপাকাবস্থায় সমাধিপদবাচ্য হয়।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এইতিনটী যোগাঙ্গকে সংযম এবং যোগান্তরঙ্গ কহে। ঐ তিনটী যোগাঙ্গ ইতর যোগাঙ্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যেহেতু ইহারা যোগ সিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ। অন্যান্য যোগাঙ্গ এরূপ নহে, তাহারা পরম্পরায় যোগের কারণ. একারণ অন্যান্য যোগাঙ্গকে বহিরঙ্গ কহে। উল্লিখিত ধারণাদি তিনটী যোগাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলে কিছুই আর অজ্ঞাত থাকে না, অতীত বা অনাগত বিষয় সকল ও বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হয়, এবং স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতে শক্তি জন্মে, অধিক কি বলিব, যোগীরা যখন যাহা ইচ্ছা করেন তখন তাহাই করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতেছে। যত প্রকার সিদ্ধি জগতে প্রসিদ্ধ আছে সে সকলই যোগীদিগের হস্তগত।

সিদ্ধি নানা প্রকার; তন্মধ্যে অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই আটটী সিদ্ধিকে * মহাসিদ্ধি কহে।

সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ। ঐ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাবশতঃ জন্মে। ঐ অবিদ্যার বিনাশক কেবল বিবেকখ্যাতি, এতদ্ভিন্ন অবিদ্যার উন্মূলক উপায়ান্তর নাই। বিবেকখ্যাতি শব্দে, প্রকৃতি প্রভৃতি জড় পদার্থ হইতে পুরুষ পৃথকভূত অপৃথক্ নহে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝায়। যেমন ধন হইলে আর নির্ধনতা-স্বরূপ দৈন্য থাকে না, সেই রূপ অবিদ্যাবিরোধী বিবেকখ্যাতি যাহার চিত্তভূমিতে পদার্পণ করে, তাহার চিত্ত হইতে তৎক্ষণাৎ অবিদ্যা দূরে পলায়ন করে; ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সিংহ-সমাগমে গজের পলায়ন; আর যেরূপ মৃত্তিকা বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্য শরাবাদিও বিনষ্ট হয়, সেই রূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে যে তৎকার্য্য প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ বিনষ্ট হইবে এবং প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ বিনষ্ট হইলে যে তৎকার্য্য সংসারও একেকালে বিনিবৃত্ত হইবে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। এইরূপে বিবেকখ্যাতি দ্বারা সংসার নিবৃত্তি হইলেই পুরুষের কৈবল্য হয়। যথা জবাসন্নিধানেই তৎপ্রতিবিম্বে স্বচ্ছ স্ফটিক-কেও রক্ত বলিয়া বোধ হয়, জবার অসন্নিধানে কখনই স্ফটিক রক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, প্রত্যুত তাহার স্বাভাবিক

---

* এই আটটী সিদ্ধি সাঙ্খ্যদর্শন প্রস্তাবে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে পুনর্ব্বার উহাদিগের লক্ষণাদি প্রদর্শিত হইল না।

শুভ্রতারই অনুভব হয়, সেই রূপ পুরুষ নির্লেপ ও স্বচ্ছ হইলেও সংসার দশাতেই চিত্তগত সুখদুঃখাদির আভাস মাত্রে "আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি অভিমানে লিপ্ত হয়েন, সংসার নিবৃত্ত হইলে আর ঐ ঐ অভিমানে জন্মে না তৎকালে পুরুষের স্বাভাবিক চিন্মাত্রস্বরূপ কেবলরূপতাই থাকে। ঐ কেবলরূপতাকেই কৈবল্য ও মুক্তি কহে। যাহার বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বিবিধ; কার্য্যবিমুক্তি আর চিত্তবিমুক্তি। কার্য্য-বিমুক্তি চারিপ্রকার; প্রথম যত জ্ঞাতব্য বস্তু আছে সে সকলই অবগত হইয়াছি আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই এইরূপ জ্ঞান, দ্বিতীয় আমার সকল ক্লেশই ক্ষীণ হইয়াছে কোন ক্লেশই নাই এইরূপ, তৃতীয় আমার দুঃখাদি অনিষ্ট সকল বিগত হইয়াছে এইরূপ, চতুর্থ আমি বিবেকখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছি এইরূপ জ্ঞান। চিত্তবিমুক্তি তিন প্রকার; প্রথম আমার বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইয়াছে ইহাদিগের আর প্রয়োজ-নান্তর নাই এইরূপ চিন্তা। দ্বিতীয় আমার সমাধি সুসম্পন্ন হইয়াছে এইরূপ চিন্তা, তৃতীয় সমাধি সুনপন্ন হওয়াতে আমি-স্বরূপে অবস্থিত হইয়াছি এইরূপ চিন্তা। কার্য্যবিমুক্তি ও চিত্ত-বিমুক্তির অবস্থান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে ঐ, প্রজ্ঞাকে সপ্তবিধ বলা যাইতে পারে। এই সপ্তবিধ প্রজ্ঞা ভিন্ন আর কোনরূপ প্রজ্ঞা বিবেকখ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্মে না।

যেরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও আরোগ্যহেতু-ভৈষজ ভেদে চতুর্ব্যূহ, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও হেয়, হেয়হেতু, মোক্ষ, ও মোক্ষহেতু ভেদে চতুর্ব্যূহ। দুঃখময় সংসারকে

হেয়, প্রকৃতি পুরুষ সংযোগকে হেয় হেতু আত্যন্তিক প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ নিবৃত্তি স্বরূপ কৈবল্যকে মোক্ষ, আর বিবেক খ্যাতি স্বরূপ সম্যক্ দর্শনকে মোক্ষহেতু কহে।

শাঙ্কর দর্শন।

শাঙ্করদর্শন সকল দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সর্বত্র সমাদরণীয়। পূর্ব্বকালে যত প্রধান প্রধান অসামান্যধীসম্পন্ন পণ্ডিত বর্গ ছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই শাঙ্করদর্শন প্রদর্শিত পথের পথিক হইয়া সাধারণের সুগমতার নিমিত্ত ঐ পথেরই পরিষ্কারচ্ছলে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এ কারণ শাঙ্করদর্শনানুযায়ী গ্রন্থ যে কত আছে তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। অধিক কি, এক মাধবাচার্য্যই যে কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাই নিশ্চয়ই করা দুষ্কর। স্বকৃত অন্যান্য গ্রন্থে শাঙ্কর দর্শন বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য্য শাঙ্কর দর্শনের সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু মাধবাচার্য্য যে কারণে শাঙ্কর দর্শনের পরিত্যাগ করিয়াছেন, অস্মদাদির পক্ষে সে কারণের অসদ্ভাব থাকায় আমরা শাঙ্কর দর্শনের পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ হইয়া তৎসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই দর্শনপ্রণালী পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হওয়াতে ইহাকে শাঙ্করদর্শন কহে, এবং শঙ্করাচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া এই অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন এনিমিত্ত এই দর্শনকে বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈতদর্শনও কহে। মহর্ষি বেদব্যাস এমত অস্ফুট রূপে

বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন যে তাহার তাৎপর্য্য কোনক্রমেই অনায়াসে বোধগম্য হয় না, বরং যাহার যে রূপ অভিপ্রায় হয় সে সেইরূপেই অর্থ করিতে পারে। একারণ বেদান্ত সূত্রের নানা প্রস্থান হয়, অর্থাৎ ঐ সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যানুসারে রামানুজ প্রস্থান, মাধ্বাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানুসারে মাধ্ব প্রস্থান ও শঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানুসারে শাঙ্কর প্রস্থান হইয়াছে *। বেদান্তসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং অধ্যায় সকলও প্রত্যেকে চারি পাদে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি, দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে অস্ফুটার্থ শ্রুতি সকলের ব্রহ্মপরত্বাদি, চতুর্থে সাঙ্খ্যমতসিদ্ধ প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ববোধক প্রমাণাভাসের সমন্বয়াদি, দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে অদ্বৈতমত-বিরুদ্ধ শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয়াদি, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও শ্রুতিদ্বারা সাঙ্খ্য মত প্রভৃতির নিরাকরণ, তৃতীয়ে সৃষ্টিক্রমনিরূপণপ্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্যত্ব সংস্থাপন, চতুর্থে প্রাণের নিত্যত্ববোধক শ্রুতি সমন্বয় পূর্ব্বক জন্যত্ব সংস্থাপন, তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুসারে জীবের সংসার গতি ক্রমাদি, দ্বিতীয়ে জগতের অবস্থাভেদাদি, তৃতীয়ে বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাঁহার বিচারাদি, চতুর্থে বেদান্তসিদ্ধ তত্ত্ব-জ্ঞান যে স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থসাধন তাহার নিরূপণাদি, চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদে সাধনবিষয়কবিচারাদি, দ্বিতীয়ে যাগাদির প্রয়াণনিরূপণাদি, তৃতীয়ে অর্চ্চিরাদিমার্গ নিরূপণাদি, চতুর্থে মুচ্যমান ব্যক্তির শরীরত্যাগানন্তর পরমজ্যোতিঃপ্রাপ্তিপ্রকরণাদি

* এতভিন্ন আরও অনেক প্রস্থান আছে, কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রচলিত নাই একারণ তাহার উল্লেখ করা হইল না।

নিরূপিত হইয়াছে, এবং সকল অধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাঙ্করদর্শনে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়—ইত্যাদি বিষয় সকল প্রাধান্যরূপে শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শাঙ্করদর্শনপ্রদর্শিতপথাবলম্বন করিয়া চলিলেই পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; কিন্তু যেমন, যাহার জলসর্প ধরিবারও ক্ষমতা নাই তাহার কাল সর্প ধরিতে যাওয়া প্রকৃতফলোপযোগী না হইয়া কেবল কালকবলে কলেবর সমর্পণ করিবার নিমিত্তই হয়, সেইরূপ যিনি অধিকারী না হইয়াই কর্ম্ম কাণ্ড সকল পরিত্যাগ করিয়া শাঙ্কর দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য সর্ব্বোপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে "জ্ঞানাদ্বৈ নরকম্" অর্থাৎ কেবল জ্ঞান কাণ্ডের আলোচনা করিলে নরক হয়, ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে কেবল নারকী হইতে হয়, ফলতঃ প্রকৃত ফলের অণুমাত্রও লাভ হয় না। এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়াও সহজ নহে, যে ব্যক্তি অধ্যয়ন বিধির অনুসারে বেদ ও বেদান্ত সকল অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ সকল এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক কাম্যকর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদিজনক যাগাদি ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ নরক কারক ব্রহ্মহত্যাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সন্ধ্যা, বন্দনাদি স্বরূপ নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থাৎ পুত্র জননকালাদিকর্ত্তব্য জাতেষ্টি প্রভৃতি, প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনা অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত শাণ্ডিল্য বিদ্যানুসারে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস উপাসনা প্রভৃতি উপাসনাকাণ্ডের

অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিতান্ত নির্ম্মল করিয়া পরিশেষে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া অভ্রান্ত হইবেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞানে ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারই ঐ ইচ্ছা অচিরাৎ ফলবতী হয়; অস্মদাদির ব্রহ্মজ্ঞানে ইচ্ছা করা দরিদ্রের রাজ্যাভিলাষের ন্যায় উপহাসাস্পদ মাত্র। ইহা প্রাচীন বৈদান্তিক মহাশয়েরাই স্ব স্ব গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন।

উল্লিখিত সাধন চতুষ্টয়ের প্রথম সাধন নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, দ্বিতীয় ইহমাত্র ফলভোগ বিরাগ, তৃতীয় শম দমাদি ষট্‌সম্পৎ, চতুর্থ মুমুক্ষুত্ব। নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক শব্দে কোন্ বস্তু নিত্য আর কোন্ বস্তু অনিত্য ইহার বিবেচনাকে বুঝায়, নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেচনা করিতে হইলে "একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য আর সকলই অনিত্য" এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ শব্দে স্রক্ চন্দন ও বনিতা সম্ভোগাদি-স্বরূপ ঐহিক সুখভোগ এবং স্বর্গভোগাদি স্বরূপ পারলৌকিক সুখভোগে যে এক কালেই বিতৃষ্ণা, তাহাকে বুঝিতে হইবে। শমাদি সম্পৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাভেদে ষড়্‌বিধ। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বিষয়ের শ্রবণাদি হইতে মনের নিগ্রহকে শম, বাহ্যেন্দ্রিয়কে শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করণকে দম, বিহিত কর্ম্মসকলের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগকে উপরতি, শীত বা উষ্ণতা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাকে তিতীক্ষা, উক্তপ্রকারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ব্রহ্ম সাধনোপযোগী বিষয়ে মনোনিবেশকে সমাধান, এবং গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। এবং মোক্ষেচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহে।

উল্লিখিত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইয়া জ্ঞান কাণ্ডের আলোচনা করিলেই অচিরাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিস্বরূপ মুক্তি-ভাজন হইতে পারে।

ব্রহ্ম সৎ, অর্থাৎ "সত্যস্বরূপ" চিৎ অর্থাৎ "চৈতন্যপদ-বাচ্য জ্ঞানের স্বরূপ" পরম আনন্দ স্বরূপ, অখণ্ড অর্থাৎ "অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয়, এবং নির্ধর্ম্মক, অর্থাৎ "ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্ম্ম নাই ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। যদিও" ঘট জ্ঞান হইতে পট জ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান পৃথক্" এইরূপ ভেদ ব্যবহার দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাত্বই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের ঐক্য সাধক কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না তথাপি বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্বলইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয় মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে একমাত্র। যথা এক মুখই তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে রূপান্তর রূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঐ স্থলে একই মুখ, মুখের ভেদ নাই, তৈলাদি রূপের উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র, সেইরূপ জ্ঞানের ঐক্য থাকিলেও ঘট পটাদি বিষয় স্বরূপ উপাধির ভেদ লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়।

আর যথা একব্যক্তিই যখন যদ্দেশের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়; তখন তাহাকে তদ্দেশের রাজা বলিতে হয়, আর যখন দেশান্তরের নৃপতি হয়েন, তখন তাহাকেই দেশান্তরের রাজাই সকলে বলে, পূর্ব্বাধিকৃত দেশের রাজা আর

কেহই বলে না, সেইরূপ যখন যাহার অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারা বিষয়ের আবরণ স্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞানদ্বারা বিষয় প্রকাশমান হয় হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন ঐরূপ না হয়, তখন তাহার জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না, অতএব জ্ঞান এক হইলেও "তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান" ইত্যাদি ভেদব্যবহারের বাধক কি আছে, বরঞ্চ জ্ঞানের ঐক্য সাধক প্রমাণই অনেক দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এস্থলে একটী প্রমাণ মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে, দেখ যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বোধ হয় না, অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পট জ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ থাকিত তাহা হইলে ঐ ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করিলেও ভেদ ব্যবহার হইতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘট জ্ঞান ও পট জ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞাত হইতে ভিন্ন" এরূপ ভেদ ব্যবহার কেহই স্বীকার করেন না, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কি রূপে সিদ্ধ হইতে পারে, বরঞ্চ ঐ ঐ জ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি লইয়াই "যেহেতু ঘট জ্ঞানের বিষয় আর পটজ্ঞানের বিষয় পট অতএব ঘট জ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদব্যবহার হয় বলিয়া ঐ ঐ জ্ঞানের উপাধিক ভেদ মাত্র আছে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, এতদ্ভিন্ন জ্ঞান সকলের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ সাধক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই, বরং ঐক্য প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতির

প্রচুরতাই দৃষ্ট হয় আরও যখন সামান্যতঃ জানা যাইতেছে যে ঘট জ্ঞানও জ্ঞান, আর পট জ্ঞানও জ্ঞান, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের কিরূপ ভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে সর্ব্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞানই এক, বিভিন্ন নহে, এই জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য, চৈতন্য, জ্ঞান হইতে পৃথকভূত নহে, এবং এই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যই আত্মা, আত্মা, চৈতন্যাভিন্ন নহে, অতএব উল্লিখিত যুক্তিক্রমে যখন জ্ঞানের ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে তখন আত্ম সকলের পরস্পর ঐক্য এবং পূর্ণচৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। এই জীবব্রহ্মের ঐক্যই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপচয় ও বিনাশরূপ ষড়্বিধবিকারের মধ্যে কোন বিকারই নাই, আত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন. এবং আত্মাই পরম আনন্দ-স্বরূপ, যেহেতু আত্মাই সকলের নিরতিশয় স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র, দেখ, আত্মার প্রীতির নিমিত্তই অন্যত্র পুত্র কলত্রাদিতে স্নেহ জন্মে, অন্যের প্রীতির নিমিত্ত আর কেহই কোন কালে আত্মাতে স্নেহ করে না। এস্থলে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, "যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীত না হয় তাহা হইলে আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞাত রহিল সুতরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি; এই দোষ পরিহারার্থে যদি আনন্দ-রূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মস্বরূপ পূর্ণানন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার মানসে কোন্ ব্যক্তি স্রক চন্দন ও বনিতাদির সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইত, সিদ্ধবস্তুর

নিমিত্ত কি লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সদোষ হইতেছে,” কিন্তু এই আপত্তি তবে বদ্ধমূল হইত, যদি আত্মার আনন্দরূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধক বশতঃ প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না, ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত অধ্যয়নশীল ছাত্র মধ্যস্থিত চৈত্রনামক ব্যক্তির অধ্যয়ন শব্দ। এই স্থলে অন্যান্য বালকের অধ্যয়ন রূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ এইটী চৈত্রের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ বিশেষ জানা যায় না বটে, কিন্তু সামান্যতঃ এই মাত্র জানা যায় যে ইহার মধ্যে চৈত্রেরও অধ্যয়ন শব্দ আছে। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ও সৎ বা অসৎ রূপে অনির্দেয় পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে, এই অজ্ঞান জগতের কারণ বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও কহে, অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপভেদে দুইটী শক্তি আছে। যেরূপ মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শক জনগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুযোজনবিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে, বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান, পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শক ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি কহে। আর যে শক্তি সহকারে অজ্ঞান উপাদান কারণ রূপে জগৎ সৃষ্টি করেন ঐ শক্তিকে বিক্ষেপ শক্তি কহে। দুই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে

দ্বিবিধ মায়া আর অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজো তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণ প্রধান অজ্ঞানকে মায়া আর মলিন অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণ প্রধান অজ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। উল্লিখিত মায়াতে পরব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব হয় ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এ কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী স্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য, আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয় ঐ প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি যাবৎ জীব পদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা * মায়া ও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুষুপ্তি আনন্দময়কোষ ও কারণশরীর কহে, এই কারণশরীরে অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য হয়েন। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তি বিশিষ্ট মায়া সহকারে নাম রূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমত বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া "এইরূপ করাই কর্ত্তব্য" এই প্রকার সংকল্প করেন; পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে

---

* জীবের নানাত্ববাদ, সকল বৈদান্তিকের মত সিদ্ধ নহে, কোন কোন বৈদান্তিক জীবের একত্ববাদ, যুক্তি দ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় অনেকেই জীবের নানাত্ববাদে নির্ভর করিয়াছেন অতএব আমরা সেই মতানুসারে জীবের নানাত্ব লিখিলাম।

পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পাঁচটী পদার্থকে পঞ্চসূক্ষ্মভূত অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র কহে। "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে" অর্থাৎ কারণে যে যে গুণ থাকে তদনুরূপ গুণ কার্য্যেও উৎপন্ন হয় এই ন্যায়ানুসারে অজ্ঞানরূপ কারণের সত্ত্ব রজ ও তম আদি গুণ ও আকাশাদি পঞ্চভূতে সংক্রান্ত হয়, কিন্তু ঐ সকল পদার্থের জাড্যের আতিশয্য প্রযুক্ত ঐ ঐ পদার্থের তমোগুণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে।

উল্লিখিত এক একটী পঞ্চভূতের এক একটী সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক জন্মে। অর্থাৎ অকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা অর্থাৎ জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে। আর ঐ পঞ্চভূতের পঞ্চ সত্ত্বাংশ মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অন্তঃকরণের উদ্ভব হয়, অন্তঃকরণ, বৃত্তি অর্থাৎ অবস্থাভেদে দ্বিবিধ * বুদ্ধি আর মন।

---

* বেদান্তপরিভাষাকার মতে অন্তঃকরণ চতুর্ব্বিধ ; মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত, যে অবস্থায় অন্তঃকরণ মন ও বুদ্ধি পদ বাচ্য হয়, তাহা মুল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে অন্তঃকরণে অভিমানাত্মক বৃত্তি হইলে অন্তঃকরণকে অহঙ্কার আর অন্তঃকরণের অনুসন্ধানাত্মক বৃত্তি হইলে অন্তঃকরকে চিত্ত কহে। ঐ চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণের যথাক্রমে চতুর্মুখ চন্দ্র, শঙ্কর, ও অচ্যুত ইঁহারা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হয়েন্। কিন্তু বেদান্তসার ও পঞ্চদশীকারের মতে অন্তঃকরণ মন আর বুদ্ধি ভেদে দ্বিবিধ অহঙ্কার আর চিত্ত, মন আর বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হইতেছে, বুদ্ধি ও মন হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে, ফলতঃ বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ

যৎকালে অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তৎকালে বুদ্ধি, আর যখন অন্তঃকরণের সংশয় বিকল্পাত্মক বৃত্তি হয়, তখন অন্তঃকরণকে মনঃপদে নির্দ্দেশ করা যায়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, বুদ্ধি, ও মনের যথাক্রমে দিক্, চন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, চতুর্ম্মুখ ইঁহারা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ঐ ঐ দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপলম্ভক অর্থাৎ প্রকাশক হয়। প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রত্যেক রাজোহংশ পঞ্চক হইতে যথাক্রমে বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, আর উপস্থরূপ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে। বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু, আর প্রজাপতি ইঁহারা যথাক্রমে ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, ঐ ঐ দেবতার অধীন হইয়াই ঐ ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথাক্রমে বচন, আদান, গমন, বিসর্গ অর্থাৎ পুরীষত্যাগ, ও আনন্দ অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগাদি সুখ এই কয়েকটী কর্ম্ম সম্পন্ন করে। পঞ্চভূতের সমুদিত রাজোহংস পঞ্চক হইতে প্রাণবায়ু জন্মে। প্রাণ, নিজবৃত্তি ভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান আর ব্যান, এই পাঁচ প্রকার * হয়। এই

হয় উভয় মতেই ফলের ঐক্য আছে; অতএব এক মত আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণ দ্বিবিধ বলিয়া লিখিত হইল।

* মতান্তরে নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামে আরও অন্য পাঁচটী বায়ু আছে, নাগ বায়ু উদ্গারণকর, কূর্ম্ম বায়ু নিমীলনকর, কৃকর বায়ু বায়ু ক্ষুধাকর, দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভনকর, এবং ধনঞ্জয় বায়ু পোষণকর, কিন্তু বেদান্তসারকার প্রভৃতির মতে এই পাঁচটী বায়ু প্রাণাদি পঞ্চবায়ুরই অন্তর্গত, পৃথগ্‌ভূত নহে, অতএব এস্থানে বায়ু পঞ্চকেরই উল্লেখ করা হইল।

প্রাণবায়ু নাসাগ্র স্থায়ী প্রাগ্‌গমন আর শ্বাস প্রশ্বাসাত্মক গমন-শালী, অপান বায়ু প্রভৃতি দেশস্থিত ও অবাগ্‌গমনবান্, বায়ু প্রভৃতি দেশ হইতে যে বায়ু নিঃসৃত হয় তাহকেই অপানবায়ু কহে, সমান বায়ু শরীরের মধ্যস্থিত, এবং ভুক্ত পীত যে অন্ন পানীয়াদি তৎ সমুদায়ের পাকজনক, উদান বায়ু কণ্ঠদেশবর্ত্তী ও ঊর্দ্ধগমনশীল, এবং ব্যানবায়ু অখিল শরীর সঞ্চারী এবং সমুদায় দেহস্থায়ী। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক সহিত বিজ্ঞানময়কোষ, এবং মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকারে মনোময়কোষ, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ, প্রাণময়কোষ হয়। এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ, জ্ঞানশক্তিমান এবং কর্ত্তৃত্বশক্তি সম্পন্ন, মনোময়কোষ, ইচ্ছাশক্তিশীল এবং করণ স্বরূপ, আর প্রাণময় কোষ, ক্রিয়াশক্তিশালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ বুদ্ধি আর মন এই সপ্তদশটী পদার্থ মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর হয়, ঐ সূক্ষ্ম শরীরকেই লিঙ্গ শরীর কহে, লিঙ্গ শরীর ইহলোক ও পরলোক গামী এবং মুক্তিপর্য্যন্ত স্থায়ী। এই এক এক লিঙ্গ শরীরের অভিমানী জীবকে তৈজস আর সকল লিঙ্গ শরীরের অভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ কহে, ঈশ্বর জীবের উপভোগ সম্পাদক স্থূল বিষয়ের সম্পাদনার্থে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পঞ্চীকরণ করেন, তাহারও প্রণালী এইরূপ "পরমেশ্বর আকাশাদি প্রত্যেককে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন, পরে প্রত্যেক ভূতের ঐ এক একটী অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া পূর্ব্বকৃত আকাশের দুই খণ্ডের যে এক খণ্ড আছে তাহাতে বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর চারি চারি খণ্ডের মধ্যে সকলেই এক একটী খণ্ড দিয়া স্থূলাকাশের এবং পূর্ব্বস্থিত

বায়ুর এক অংশে আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীর ঐ চারি চারি অংশ হইতে এক এক দিয়া স্থূল বায়ুর এবং ঐ রীতিক্রমে স্থূল তেজ জল ও পৃথিবীরও সৃষ্টি করেন। এইরূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকেই পঞ্চস্থূল ভূত কহে। এই স্থূল ভূতেই শব্দাদি গুণের অভিব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ হয় যদিও সূক্ষ্ম ভূতেও শব্দাদি গুণ আছে তথাপি তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হয় না। আকাশের গুণ প্রতিধ্বনিস্বরূপ শব্দ, বায়ুর গুণ বাশী এইরূপ অব্যক্ত শব্দ ও অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ "না শীত না উষ্ণ মধ্যমরূপ স্পর্শ, তেজের উষ্ণস্পর্শ, ভুগু ভুগু এইরূপ অনুকরণ শব্দ, জলের চুলু চুলু এইরূপ অনুকরণশব্দ শীতস্পর্শ সুকরূপ এবং মধুর রস, এবং পৃথিবীর গুণ কডকডা এইরূপ অস্ফুটশব্দ, কঠিনস্পর্শ, শুক্ল নীল ও পীতাদি নানা রূপ, কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর এই ছয় রস, এবং সুরভি ও অসুরভিভেদে গন্ধদ্বয় আছে। যেরূপ পরমেশ্বর পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ করেন, সেইরূপ তেজ জল ও পৃথিবী এই তিন ভূতের ত্রিবৃৎ করণও করেন, তাহা এইরূপ পরমেশ্বর পৃথিবী জল ও তেজ এই তিনটী ভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন, পরে প্রত্যেকের ঐ এক এক অর্দ্ধাংশকে পুনরায় দুই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে জলের এবং তেজের ঐ এক এক খণ্ড দিয়া মিশ্রিত করেন এবং অবশিষ্ট জলের অর্দ্ধাংশে পৃথিবী ও তেজের ঐ এক এক খণ্ড দিয়া ত্রিবৃৎ কৃত জল ও তেজের সৃষ্টি করেন। এইরূপে পঞ্চীকৃত * ও ত্রিবৃৎ কৃত স্থূলভূত হইতেই

* পঞ্চীকৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর ॥০ আট আনা আর চারি ভূতের ৵০ দুই দুই আনা করিয়া আট আনা আছে; পঞ্চীকৃত

যথা সপ্তৰ ভূর, ভুবর, স্বর, মহর, জনর, তপর, আর সত্য এই সাতটী ক্রমশঃ উপরি উপরি বর্ত্তমান উর্দ্ধতন লোক, আর অতল বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল মহাতল, পাতল, এই সপ্ত যথাক্রমে অধোহধো বর্ত্তমান অধস্তন লোক ও স্থূল শরীর এবং অন্নপানীয়াদির উৎপত্তি হয়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ আর উদ্ভিজ্জভেদে স্থূলশরীর চতুর্ব্বিধ। জরায়ুতে * যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে জরায়ুজ কহে, ঐ শরীর মনুষ্য ও পশ্বাদির। অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে অণ্ডজ কহে; ঐ শরীর পক্ষী ও সর্পাদির। স্বেদ অর্থাৎ উষ্ম হইতে যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে স্বেদজ কহে; ঐ শরীর মশক ও বৃশ্চিকাদির। এবং উর্দ্ধ ভেদ করিবা অর্থাৎ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে উদ্ভিদ কহে; ঐ শরীর লতা ও বৃক্ষাদির। বৃক্ষাদিরও চৈতন্য আছে, এবং পুণ্য পাপের ভোগ হয় বলিয়া উহাদিগেরও শরীর স্বীকার করিতে হয়। এইস্থূল দেহ সকলের অভিমানীকে বৈশ্বানর এবং এক এক স্থূল শরীরাভিমানী জীবকে বিশ্ব কহে। এই স্থূল দেহই অন্নময়কোষপদবাচ্য; ঐ স্থূলদেহের কান্তি ও পুষ্টির

জলাদিতেও এইরূপ জানিবে। ত্রিবৃৎকৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর ৷৹ আট আনা আর জলের ।৹ চারি আনা ও তেজের ।৹ চারি আনা আছে, ত্রিবৃৎকৃত জলে জলের ৷৹ আট আনা পৃথিবীর ।৹ চারি আনা তেজের ।৹ চারি আনা আছে, ত্রিবৃৎকৃত তেজেতেও এইরূপ জানিবে।

* জরায়ুশব্দে গর্ভবেষ্টন চর্ম্মস্থালীকে বুঝায়, বঙ্গদেশে যাহাকে ফুল্ কহে।

কারণ অন্ন ও পানীয়াদির ভক্ষণ। অন্ন উদরস্থ হইলে তাহার স্থূলাংশে পুরীষ, মধ্যম অংশে মাংস, এবং সূক্ষ্মাংশ মনের পুষ্টি হয়, আর পীত পানীয়াদি বস্তুর স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্মাংশ যথাক্রমে মূত্র, রক্ত ও প্রাণের পুষ্টিরূপে পরিণত হয়। ঘৃতাদি ভক্ষণ করিলে ঐ ঘৃতাদির স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্মাংশ ক্রমশঃ অস্থি, মজ্জা ও বাক্‌শক্তি রূপে পরিণত হয়।

যদিও বাস্তবিক পরব্রহ্মভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা, এই জগতে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদায়ই রজ্জুসর্পের ন্যায় অজ্ঞান কল্পিত মাত্র, এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, জীবাত্মা আর পরমাত্মাই জীবাত্মা, অতএব এই জগতের সৃষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভাগ ইত্যাদি, করা বন্ধ্যার পুত্রের নামকরণের ন্যায় উপহাসাস্পদ এবং "দ্বৈতাদ্বৈ ভয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে অধর্ম্মজনক হইতেছে ; তথাপি যেরূপ বালককে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইতে হইলে প্রথমতঃ মিষ্ট দ্রব্য দিতে হয় নতুবা কখনই তাহার তিক্ত ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি জন্মে না, যদিও ঐ বালকের পক্ষে মিষ্ট দ্রব্য অপকারক এবং তিক্ত দ্রব্য উপকারক হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ বালক বাল্য দোষে দূষিত হইয়া আপাততঃ রমণীয় মিষ্ট দ্রব্যকেই উপকারক, আর দুঃসেব্য বলিয়া তিক্ত ঔষধকে অপকারক বিবেচনা করে, সেইরূপ সাক্ষাৎ প্রতীয়মান আপাততঃ সুখকর জগতের মিথ্যাত্ব প্রভৃতি স্বীকারও নিশ্চয়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা অজ্ঞানদোষে দূষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভবে না, বরং জগতের সত্যত্বেরই যৌক্তিকতা ও ঔচিত্য হৃদয়ে উদিত হয় ; অতএব অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিগুর্ণ,

নির্ব্বিকার ও নিরাকার পরব্রহ্ম হঠাৎ বুদ্ধিপ্রবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত অসম্ভাবিত বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ জগতের সত্যত্বাদি স্বীকার করিয়াই সৃষ্টিক্রমাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যথা মরুমরীচিকায় জলভ্রম হইলে যতক্ষণ ঐ ভ্রান্তিকল্পিত জলের স্বরূপ ও কারণাদির অনুসন্ধান রূপ তত্ত্বানুসন্ধান না হয়, ততক্ষণ ঐ জলকে কোন মতেই মিথ্যা বোধ হয় না, সত্য বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা ঐ কল্পিত-জলের স্বরূপ ও করণাদি অবগত হওয়া যায়, তখন আর ঐ জলকে সত্য বলিয়া বোধ হয় না, তখন সত্যস্বরূপ মরুমরীচি-কাই প্রকাশ হয়, সেইরূপ যত কাল পরব্রহ্মে পরিকল্পিত এই জগতের স্বরূপ ও কারণাদির অনুসন্ধান না হইতেছে, ততকাল পর্য্যন্ত জগৎ অসৎ হইয়াও সৎরূপে প্রতীত হইতেছে; কিন্তু যখন ইহার স্বরূপ ও কারণাদির নিরূপণ দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইবে, তখন আর জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে না, অসৎ বলিয়াই বোধ হইবে, এবং তৎকালে সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মই কেবল প্রকাশমান হইবেন। অতএব জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও জগৎকে সত্য বলিয়া সৃষ্টিক্রমাদির প্রদর্শন করা কেবল জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণের নিমিত্ত হইতেছে, সুতরাং অদ্বৈতমত প্রদর্শন প্রস্তাবে সৃষ্টিক্রমাদি-প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রকৃতোপযোগী সন্দেহ নাই। উল্লিখিত রূপে অজ্ঞান নিবৃত্তিপর্য্যন্ত সংসার দশায় জগতের সত্যত্ব প্রতীতি হয় বলিয়া সংসারদশায় জগৎ সৎ আর তদন্তে জগৎ অসৎ; অতএব জগতের সত্যত্ব ও অসত্যত্ব উভয়ই বিরুদ্ধ হইতেছে না। পরমেশ্বর উল্লিখিতরূপে কত দিন অসৎ

সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ণয় করা যায় না এবং "এই অবাধ জগৎ সৃষ্টি করিলেন, ইহার পূর্ব্বে জগৎ ছিল না" এরূপ কল্পনা করিলেও নানা দোষ ঘটে বলিয়া সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

এস্থলে কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে, "সংসার শব্দে দৃশ্যমান পদার্থকে বুঝায়, সুতরাং যখন সকল বস্তুকেই সাদিত্ব দেখিতেছি তখন আর সংসারের অনাদিত্ব কোথায় রহিল"। কিন্তু এ আপত্তি কেবল অনাদি শব্দের তাৎপর্য্যার্থের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিতমাত্র বলিতে হইবে; যেহেতু অনাদি শব্দের এরূপ অর্থে তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু "সংসার প্রলয়, পুনঃ সংসার, পুনঃ প্রলয় ও পুনঃ সংসার" এইরূপ সংসার প্রবাহের আদি নাই এই অর্থেই তাৎপর্য্য। অতএব যখন দৃশ্যমান প্রবাহের আদি দৃষ্ট হইতেছে না, তখন কেবল দৃশ্যমান কয়েকটী বস্তুর সাদিত্ব দর্শন করিয়া সংসারের অনাদিত্ব খণ্ডিত হইতে পারে না। যেরূপ মায়াবী ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দ্বারা ঐন্দ্রজালিক বস্তু সকল প্রকাশ করিয়া জনগণের দর্শনৌৎসুক্য নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল বস্তুর সংহার করে, সেইরূপ পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তি-শালীমায়া সহকারে জগৎসৃষ্টি করিয়া জনগণের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল প্রদানান্তে পরিশেষে জগতের প্রলয় করেন।

প্রলয় চারি প্রকার; নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। সুষুপ্তিকে অর্থাৎ যে অবস্থায় অত্যন্ত নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ঘট পট দি বিষয়ের জ্ঞানাদি না হয় সেই অবস্থাবিশেষকে নিত্য প্রলয় কহে। ঐ নিত্য প্রলয় হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সংস্কার এবং লিঙ্গশরীর প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থমাত্র কারণরূপে অবস্থিত হয়, আর সকল বস্তুর প্রলয় হইয়া যায়, কিন্তু ঐ নিত্যপ্রলয়-

স্বরূপ সুষুপ্তির ভঙ্গ হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত সংসার জন্মে, এজন্য ঐ প্রলয়ের আপাততঃ অনুভব হয় না। জীবগণের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে যে তিনটী অবস্থা আছে, তন্মধ্যে নিত্য প্রলয়স্বরূপ সুষুপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট; এই অবস্থায় জীবের পরব্রহ্ম ভাব উপস্থিত হইয়া কেবল পরমানন্দের অনুভব হয়, তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না। কার্য্য ব্রহ্মের লয়নিবন্ধন সকল কার্য্যের বিলয়কে প্রাকৃত লয় কহে। উহার রীতি এইরূপ; যিনি অতি কঠোর তপস্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা "ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী" অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং এইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম সঞ্চিত করিয়া, ঐ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীও হইয়াছেন, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডাধিকার অনিচ্ছাপূর্ব্বকও অধিকৃত করিয়া, পরিশেষে ঐরূপ ফলভোগ দ্বারা ঐ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই "বিদেহ কৈবল্য" নামক পরম মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তৎকালে ঐ ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মলোক যত ব্রহ্মজ্ঞানী থাকেন, তাঁহারাও ঐ ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন; এইরূপ ব্রহ্মাকেই কার্য্যব্রহ্মা এবং তাঁহার ঐরূপ মুক্তিকেই কার্য্যব্রহ্মবিলয় কহে। ঐরূপ কার্য্যব্রহ্মার লয় হইলে তাঁহর অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডেরও মায়াতে লয় হয়; ঐরূপ লয়কেই কার্য্যব্রহ্মার লয় নিবন্ধন সকল কার্য্যের লয় কহে। উক্ত রূপ মায়াত্মক প্রকৃতিতে ঐ লয় হয় বলিয়া উহাকে প্রাকৃত লয় কহে। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ব্রহ্মের দিনাবসান নিমিত্তক ত্রৈলোক্যের লয়কে নৈমিত্তিক প্রলয় কহে। কার্য্যব্রহ্মা নিজ দিনাবসানে ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া শয়ন করেন এবং নিজ রাত্রির অবসানে

গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রির পরিমাণও সমান্য নহে; অস্মদাদির * চতুর্যুগসহস্র-পরিমিতকালে ব্রহ্মার এক দিন আর ঐরূপ কালে এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এতাদৃশ প্রকাণ্ড রাত্রির মধ্যে লোকত্রয়ের কিছুই থাকে না কেবল নৈমিত্তিক প্রলয় মাত্র থাকে, অতএব নৈমিত্তিক প্রলয়ের পরিমাণও চতুর্যুগসহস্র। ব্রহ্মজ্ঞাননিমিত্তক পরম মুক্তি প্রাপ্তিকে আত্যন্তিক প্রলয় কহে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংসারের মূল কারণ মূলাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আর সংসারস্থিতির বা পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা কি? ঐ প্রলয় হইলে আর সংসার জন্মে না বলিয়া ইহার "অত্যন্তিক প্রলয়" এই নামটী যৌগিক হইতেছে। প্রলয়ের ক্রম এইরূপ; প্রথমতঃ পৃথিবীর লয় জলে হয়, জলের লয় তেজে, তেজের লয় বায়ুতে, বায়ুর লয় আকাশে, আকাশের লয় জীবের অহঙ্কারে, তাহার লয় হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কারে এবং তাহার লয় অজ্ঞানে হয়; এইরূপ "কার্য্য লয় ক্রমেই কারণের লয়" এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য বস্তুরও লয়ক্রম কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ লয় ক্রমই বিষ্ণুপুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাই প্রামাণিক, এতদ্ভিন্ন অন্যমত-সিদ্ধ লয়ক্রমে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই।

প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি ভেদে ষড়্‌বিধ। প্রত্যক্ষ নামক জ্ঞানের করণস্বরূপ শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে। জ্ঞান বৃত্তি ও ফলভেদে দ্বিবিধ। যথা জলাশয়স্থিত জল ছিদ্র হইতে নির্গত

* সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ।

হইয়া প্রণালিকা দ্বারা কেদারখণ্ডে * প্রবেশ করিয়া কেদারাকারে অর্থাৎ কেদারের যেরূপ চতুষ্কোণাদি আকার থাকে সেইরূপ আকারে পরিণত হয়, তথা প্রত্যক্ষ স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলে অন্তঃকরণ ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে নিপতিত হইয়া বিষয়ের যেরূপ আকার থাকে সেইরূপ আকারে পরিণত হয়, ঐ পরিণামকেই বৃত্তিরূপজ্ঞান কহে। বৃত্তিরূপজ্ঞান দ্বারা বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয়, আর ফলরূপ জ্ঞান দ্বারা বিষয়ের স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়। ফলরূপজ্ঞান পরব্রহ্ম স্বরূপ চৈতন্য, সুতরাং ফলরূপজ্ঞান নিত্য। যদি অজ্ঞান দ্বারা ঘটাদি বিষয় আবৃত না থাকিত তাহা হইলে সর্ব্বদাই ঘটাদি বিষয় অনুভূয়মান হইত, কাহারই কখন কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকিত না, কারণ ব্যক্তিরও সকল বস্তু প্রত্যক্ষ হইত, জ্ঞানের নিমিত্ত আর ইন্দ্রিয়গণের আবশ্যকতা থাকিত না। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কেবল বিষয়ের আবরণ স্বরূপ অজ্ঞানের নিরাশ হয় বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিরূপ কারণের আবশ্যকতা আছে; যেহেতু ঐ আবরণ নষ্ট না হইলে বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয় না। অতএব ফলরূপজ্ঞান নিত্য হইলেও উক্ত আবরণের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ সর্ব্বদা সকলের সর্ব্ববিষয়ের প্রকাশ হয় না। যখন যাহার উল্লিখিত বৃত্তিরূপজ্ঞান দ্বারা যে বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয় তৎকালেই তাহার সম্বন্ধে সেই বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়, আর যখন এরূপ না হয় তখন ঐরূপ প্রকাশও হয় না। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল, ফলরূপজ্ঞান নিত্য হইয়াও অজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ জন্যের ন্যায় কারণ নিয়ম্য ও অসার্ব্বত্রিক হইতেছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্যান্য বিশেষ ধর্ম,

* কেদারশব্দে ক্ষেত্রকে বুঝায়।

অনুমান, উপমান ও আগমাদির অর্থাৎ শব্দাদি প্রমাণের বিষয় ও স্বরূপাদি ন্যায়দর্শন প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে; ন্যায়মতবিরুদ্ধ যে যে বিশেষ আছে তাহা সংস্কৃত ভাষাতেই চমৎকৃত এবং সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, প্রচলিত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইলে তাদৃশ রমণীয় বা সুস্পষ্ট হওয়া কঠিন, এ বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত হইল না।

অর্থাপত্তি (কল্পনা) রূপ প্রমিতির করণকে অর্থাপত্তি প্রমাণ কহে। যাহা ব্যতিরেকে যাহা অনত্ভাবিত হয়, তাহার উপপাদ্য সে হয়। আর যাহার অসম্ভবে যাহার অসম্ভব হয়, সে তাহার উপপাদক হয়; যথা দিবাতে অভোক্তা ব্যক্তির শরীর স্থূলতা উপপাদ্য আর রাত্রিভোজন উপপাদক; যেহেতু দিবাতে অভোক্ত ব্যক্তির শরীরস্থূলতা উহার রাত্রি ভোজন ব্যতীত কোন মতেই সম্ভবে না। অতএব যখন দিবাতে অভোক্তা ব্যক্তির শরীরস্থূলতা দৃষ্ট বা শ্রুত হইবেক, তখন ঐ ব্যক্তির রাত্রিভোজন সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত হইবে। দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি ভেদে অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বিবিধ। দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুতে উপপাদ্যের অনুপপত্তি দ্বারা উপপাদকের কল্পনাকে যথাক্রমে দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি কহে। যেমন দৃশ্যমান ঐন্দ্রজালিক বস্তুর নিষিধ্যমানত্ব রূপ উপপাদ্য জ্ঞান দ্বারা তদুপপাদক মিথ্যাত্বের কল্পনাকে দৃষ্টার্থাপত্তি, আর "জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই" এই শব্দ শ্রবণানন্তর জীবিত ব্যক্তির বহিঃসত্বব্যতিরেকে কোন মতেই গৃহে অসত্ত্ব সম্ভবে না—এই রূপ অনুপপত্তি জ্ঞান দ্বারা উহার বহিঃসত্ব কল্পনাকে শ্রুতার্থাপত্তি কহে। শ্রুতার্থাপত্তিও অভিধানানুপপত্তি ও

অভিহিতানুপপত্তি ভেদে দ্বিবিধ। বাক্যের একদেশ মাত্র মাত্র শ্রবণ করিয়া দেশান্তরের কল্পনাকে অভিধানানুপপত্তি কহে। যথ "দ্বারম্" অর্থাৎ দ্বারকে, এই মাত্র শ্রবণ করিয়া "পিধেহি" অর্থাৎ পিধান (আবরণ কর) এই পদের কল্পনা। শ্রুত অর্থের সম্ভবপরত্ব প্রতিপাদনার্থে অর্থান্তরের কল্পনাকে অভিহিতানুপপত্তি কহে। যথা "অদ্য পঙ্গু ব্যক্তি অতি দূরদেশ হইতে আগত হইল" ইহ, শ্রুত হইলে, পঙ্গুর গতি শক্তি না থাকা প্রযুক্ত তাহার দূর হইতে আগমন অসম্ভব, এই রূপ অনুপপত্তি জ্ঞান দ্বারা তদুপপাদক শকটাদি রূপ দ্বার কল্পনা।

প্রতিযোগীর যে গ্যানুপলম্ভকে অনুপলব্ধি প্রমাণ কহে। কোন বস্তুর অভাব হয় তাহার প্রতিযোগী সেই বস্তুই হয়, যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, এবং পটাভাবের প্রতিযোগী পট। যে যে কারণ সত্ত্বে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই কারণের সদ্ভাব থাকিলে কেবল প্রতিযোগীর অসত্ত্ব নিবন্ধন যে প্রতিযোগীর অপ্রত্যক্ষ তাহাকে যে গ্যানুপলম্ভ কহে। এই যোগ্যানুপলব্ধি কোন স্থলে সম্ভবে ও কোন স্থলেই বা উহার দ্বারা অভাবের প্রতীতি হয়, ইহার নিশ্চয় করিতে হইলে এই মাত্র স্থির করিতে হইবে "যদি অমুক বস্তু এই স্থানে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার প্রত্যক্ষ হইত"। এইরূপ প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের আপত্তি যে স্থানে উত্থাপিত হইতে পারে সেই স্থানেই উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা অভাবের অনুভব হয়, আর যেস্থলে ঐ রূপ আপত্তি না হয় সে স্থানে অভাবের অনুভব হয় না; যথা উজ্জ্বলালোকান্বিত আলয়ে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির 'যদি এই গৃহে ঘট থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই এস্থলে ঘটের

প্রত্যক্ষ হইত" এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় বলিয়া ঐ স্থলে ঐ ব্যক্তির ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। আর অন্ধ ব্যক্তির বা অন্ধকার গৃহে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির ঐ রূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না বলিয়া উক্ত স্থলে উক্ত প্রমাণ দ্বারা অভাবেরও প্রতীতি হয় না। এই অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা কেবল অভাবেরই অনুভব হয় এবং ইহা অভাবস্বরূপ, এ কারণ এই প্রমাণকে কোন কোন পণ্ডিত অভাব প্রমাণ কহেন। অভাব চতুর্বিধ; প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও ভেদ। ন্যায়মতে প্রাগভাবাদির লক্ষণ যেরূপ, এমতেও প্রায় সেইরূপ; বিশেষ এই, ন্যায় মতে ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকার নাই, এ মতে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ন্যায়মতে ভেদ এক রূপ, এ মতে ভেদ দ্বিবিধ; সোপাধিক ও নিরুপাধিক *। যথা আকাশ এক হইলেও ঘট ও মঠ রূপ উপাধিদ্বয়ের ভেদ লইয়া "ঘটাকাশ হইতে মঠাকাশ ভিন্ন" এ রূপ যে ভেদ ব্যবহার হয় তাহাকে ঔপাধিক ভেদ আর ঘট ও মঠের পরস্পর ভেদকে নিরুপাধিক ভেদ কহে।

উল্লিখিত ষড়্বিধ প্রমাণ দ্বারাই যাবতীয় পদার্থের সিদ্ধি হইবেক; ঐ ষড়্বিধ প্রমাণাতিরিক্ত আর প্রমাণ নাই। পৌরাণিক সম্ভব ও ঐতিহ্য নামক যে অতিরিক্ত প্রমাণ দ্বয় স্বীকার করেন তাহাতে কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না বলিয়া তাহা প্রামাণরূপই গণ্য হইতে পারে না। "যাহার লক্ষ মুদ্রা আছে তাহার শত বা সহস্র মুদ্রা থাকা সম্ভব" এই

---

* উপাধির ভেদ লইয়া কল্পিত যে ভেদ তাহাকে সোপাধিক এবং বাস্তব যে ভেদের পারমার্থিক বাধ হয় না তাহাকে নিরুপাধিক ভেদ কহে।

রূপ সম্ভবকে সম্ভব প্রমাণ কহে, আর "এই বটবৃক্ষে যক্ষ আছে" এইরূপ প্রবাদ পরম্পরাকে ঐতিহ্য প্রমাণ কহে, এই ঐতিহ্য প্রমাণ দ্বারা ঐ বটবৃক্ষে যক্ষ আছে সিদ্ধ হইবেক। এইরূপ পৌরাণিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন; কিন্তু বিশিষ্ট বিবেচনা করিলে বোধ হইবে সম্ভব প্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত, অনুমান হইতে বিভিন্ন নহে, এবং ঐতিহ্য প্রমাণের মধ্যে প্রায় অনেক ঐতিহ্য প্রমাণের প্রমাণ্যই নাই, আর যাহার আছে সে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত। অতএব ইহ সিদ্ধ হইল যে, প্রত্যক্ষাদি ষড়্‌বিধ প্রমাণাতিরিক্ত আর প্রমাণান্তর নাই। এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিমান্ জনগণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্ভোগাদির অস্থিরত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরম সুখস্বরূপ পরাৎপর পরব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত তৎসাধনীভূত-তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইয়া উহার উপায় স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন।

ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা সকল বেদান্তেরই পরব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণকে শ্রবণ কহে। ঐ ষড়্‌বিধ লিঙ্গের প্রথম লিঙ্গ উপক্রম ও উপসংহার, দ্বিতীয় অভ্যাস, তৃতীয় অপূর্ব্বতা, চতুর্থ ফল, পঞ্চম অর্থবাদ ও ষষ্ঠ উৎপত্তি। যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে সে প্রকরণে আদিতে ও অন্তে সে বিষয়ের উৎকীর্ত্তনকে যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার কহে; যথা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের আদিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইহা দ্বারা এবং অন্তে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক এই সকল) ইহা দ্বারা ঐ প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মেরই উৎকীর্ত্তন আছে। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের পুনঃপুনঃ

কীর্ত্তনকে অভ্যাস কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই "তত্ত্বমসি" (অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই তুমি) ইহা নয়বার কীর্ত্তিত হইয়াছে; প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের প্রমাণান্তর দ্বারা অপ্রাপ্তিকে অপূর্ব্বতা কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই ঐ প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের বেদান্তাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা অসম্প্রাপ্তি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিকে ফল কহে; যথা "আচার্য্যবান্ বেদ" ইত্যাদি "অথ সম্পৎস্যে" ইত্যন্ত গ্রন্থসন্দর্ভ দ্বারা ঐ প্রপাঠকে প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের জ্ঞানানুষ্ঠানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি। তৎপ্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের তৎপ্রকরণে প্রশংসাকে অর্থবাদ কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই "উত তমাদেশমপ্রাক্ষীঃ" ইত্যাদি "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা, যাহা শ্রুত হইলে আর কিছুই অশ্রুত থাকে না এবং যাহা বিজ্ঞাত হইলে অবিজ্ঞাত বস্তুও বিজ্ঞাত হয় সেই পরব্রহ্মের প্রশ্ন করিয়াছে, ইত্যাদি প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের প্রশংসা। তৎপ্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাবতা প্রতিপাদনার্থ যুক্তির উপন্যাসকে উপপত্তি কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই 'যথা সৌম্যৈকেন" ইত্যাদি "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা "যেরূপ এক মৃৎপিণ্ড জানিলেই তাহার বিকার স্বরূপ ঘট সরাবাদি জানা হয়, ঘট সরাবাদি বাক্যদ্বারা কল্পিত নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য" ইত্যাদি সদৃষ্টান্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত ক্রমে শ্রুত অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের বেদান্তানুগুণ যুক্তি দ্বারা অনবরত চিন্তনকে মনন কহে। দেহাদি বিবিধ বিষয়ক বুদ্ধিপরম্পরা পরিত্যাগ পুরঃসর একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধিধারাকে নিদিধ্যাসন কহে।

সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা ইত্যাদি বিকল্পের (অর্থাৎ বিভাগের) বিলয়-নিরপেক্ষ আর তৎসাপেক্ষ পরব্রহ্ম বস্তুতে নিবিষ্ট চিত্তের স্থিরতাকে যথাক্রমে সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে। নির্ব্বিকল্পক সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নির্ব্বায়ু দেশস্থিত প্রদীপ-শিখার ন্যায় নিশ্চল হয় উক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধির অঙ্গ যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ পাতঞ্জলদর্শনে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

এই নির্ব্বিকল্পক সমাধি সিদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত হওয়া যায়। জীবন্মুক্ত তাঁহাকেই বলা যায় যাঁহার অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মূলাজ্ঞানের নিরসনান্তর স্ব স্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হওয়াতেই অজ্ঞান ও তৎকার্য্য দ্বারা সঞ্চিত সকল কর্ম্ম, সংশয় এবং বিপর্য্যয়াদি নিরস্ত হওয়ায় সকল বন্ধ দূরীকৃত হইয়াছে, এবং যাঁহার "মাংস, শোণিত, মূত্র ও পুরীষ পূরিত শরীর অন্ধ্য, মান্দ্য এবং অপটুত্বাদি দোষে দূষিত ইন্দ্রিয় সকল, এবং ক্ষুৎপিপাস-শোক-মোহাদি-ভাজন অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাজনিত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন" ইহা দৃষ্টিগোচর হইলেও পরমার্থ রূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, যেরূপ "ইহা ইন্দ্রজালমাত্র" এবম্প্রকার যাহার নিশ্চয় আছে সে ঐ ইন্দ্রজাল দর্শন করিয়াও তাহার পরমার্থত্ব দর্শন করে না। যদিও উক্ত জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বৈধ বা নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুভাদৃষ্ট বা অশুভাদৃষ্ট কিছুই জন্মে না সত্য, তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তির নিষিদ্ধ বিষয়ে বিতৃষ্ণ হওয়া উচিত, কারণ যদি জ্ঞানী হইয়াও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান

করেন তাহা হইলে কুকুরের সহিত জ্ঞানীর আর ভেদ কি রহিল? জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অলঙ্কারের ন্যায় অণিমা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান-সাধন সিদ্ধি এবং দ্বেষশূন্যতা প্রভৃতি সদ্গুণ স্বয়ংই উপস্থিত হয়। জীবন্মুক্তব্যক্তির * ভোগ দ্বারা প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় হইলে বর্ত্তমান শরীর পতনান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্মৈক-ভাব স্বরূপ) পরম মুক্তি লাভ হয়।

এস্থলে দ্বৈতমতাবলম্বীরা মহাবাগাড়ম্বরসহকারে এই এক আপত্তি করেন "যদি ব্রহ্মের সহিত জীবের বাস্তবিক ভেদ না থাকে জীবই পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়, তবে জীবের অনর্থনিবৃত্তি এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি রূপ পরম মুক্তি স্বতঃসিদ্ধই আছে, তন্নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না, সিদ্ধ বস্তুর সাধনে কে যত্নবান্ হইয়া থাকে?" কিন্তু এই আপত্তি কেবল জিগীষা ও স্থূলদর্শিতা প্রভৃতি দোষের কার্য্য বলিতে হইবে, যেহেতু সিদ্ধ বস্তুরও অসিদ্ধত্ব ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রম নিরাকরণার্থ উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়; ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত, দশজন মূঢ় ব্যক্তি, নদী পার হইয়া সকলেই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখে যে নয়জন বই হয় না; তখন তাহারা "আমরা দশজন আসিয়াছি নয়জন বই হয় না কেন, তবে বোধ করি একজন কুম্ভীরহত হইয়াছে" এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রন্দন করে; কিন্তু যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক

---

* যে কর্ম্ম দ্বারা শরীর হয় তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে, ভোগ না হইলে কোন ক্রমেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, একারণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিবার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিতে হয়।

"দশমস্ত্বমসি" (দশম তুমি) এইরূপ উপদিষ্ট হয়, তখন আপনাকে লইয়া গণনা করাতে "দশজনই আছি" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অলব্ধ বস্তুর লাভে পরম আনন্দত হয়, আর এইরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে অন্যমনস্কতা অবস্থায় নিজস্কন্ধে গাত্রমার্জনী রাখিয়া অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হয়। অতএব জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য উপায়াবলম্বন করায় হানি কি? বরং উক্ত যুক্তিক্রমে অবশ্য কর্ত্তব্যই হইতেছে; অতএব শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ স্থূল যুক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা কখনই হীরক তুল্য অদ্বৈত মত খণ্ডিত হইতে পারে না।

জৈমিনি দর্শন।

জৈমিনি দর্শন দ্বাদশাধ্যায় যুক্ত, ও মহর্ষি জৈমিনির কৃত, এই জন্য ইহার জৈমিনিদর্শন এই নামটী যৌগিক হইতেছে এবং ইহাতে অনেক বেদের মীমাংসা থাকায় ইহাকে মীমাংসা দর্শনও কহে। মীমাংসাদর্শন ধর্ম্মদর্শনের দর্পণস্বরূপ দুর্গম বেদমার্গে সুখসঞ্চলনের বাষ্পীয় রথ সদৃশ। এবং শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ-ভঞ্জক মধ্যস্থস্বরূপ। যে ব্যক্তি মীমাংসা সন্দর্শন না করিয়া শাস্ত্রসমুদ্র হইতে ধর্ম্মের উত্তোলনে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি, যেরূপ অমৃতের আশায় অসুরগণ ক্ষীরসমুদ্র হইতে বিষ উৎপাদন করিয়া জগন্মণ্ডলকে একেকালে ক্ষয়পন্থা-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেইরূপ শাস্ত্র সমুদ্র হইতে অধর্ম্মবিষ উত্তোলন করিয়া স্বস্বভাবলম্বী ধার্ম্মিকাভিমানী জনগণকে নরকনাথ হস্তে সমর্পণ করে ইহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ মীমাংসা দর্শনের শরণাপন্ন

না হইলে বেদ ও স্মৃত্যাদির তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় বা বিরোধ ভঞ্জন করা সুকঠিন; দেখ, বেদে এই মন্ত্র লিখিত আছে, যে, সোমযাগে পদধূলি ধূপ কাষ্ঠে দিতে ও ঐ পদধূলির নিমিত্ত পাদ গ্রহণ করিতেও হয়, কিন্তু কাহার পদধূলিগ্রহণ করিতে হয় তাহার কিছু মাত্র নির্দ্দেশ নাই, সুতরাং যে স্থলে যে কাহার পাদ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করা মীমাংসাদর্শন ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবে। অতএব মীমাংসাদর্শনাবলম্বন করিয়া ঐ স্থলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, যে, যখন ঐ সোমযাগে সোমের ক্রয়ার্থে গোর আনয়ন করিতে হয় এইরূপ স্থানান্তরে লিখিত আছে, তখন ঐ যাগে গোই উপক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া গোরই পাদগ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাতেই বেদের তাৎপর্য্য সন্দেহ নাই। যেরূপ ঐ স্থলে বেদের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় করা সুকঠিন, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃত্যাদির পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক ঐ উভয়ের মান্যতা সংস্থাপন করাও সামান্য কঠিন নহে। যথা শ্রুতিতে লিখিত আছে, ইন্দ্রযোগে ঔড়ুম্বরীকে * স্পর্শ করিতে হয় আর কাত্যায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে, ঐ যোগে ঔড়ুম্বরীকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত অর্থাৎ আবৃত করিতে হয়, এইক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, যদি স্মৃত্যানুসারে ঔড়ুম্বরীকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে শ্রুতির

---

* ঔড়ুম্বরী শব্দের অনেকে অনেক অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন ঔড়ুম্বরী শব্দে তাম্রপ্রতিমা; অধিকরণ কৌমুদীকার কহেন, পশুবন্ধনের নিমিত্তে উড়ুম্বর বৃক্ষ নির্ম্মিত স্তম্ভ, এবং অধিকরণমালা ও দর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্যের মতে উড়ুম্বর-বৃক্ষের শাখা।

অমান্য করা হয়, আর যদি শ্রুতির অনুরোধে উড়ুম্বরীকে আবৃত না করা যায়, তবে স্মৃতির অবমাননা করা হয়, সুতরাং বিরুদ্ধভাবাপন্ন নৃপদ্বয়ের আশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় উভয়পক্ষ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যেমন ঐ আশ্রিত ব্যক্তি, যদি সন্ধির উপায় অবলম্বন করিয়া সন্ধিবিধান দ্বারা ঐ বিরোধিনৃপদ্বয় মান্যতা সংস্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে উভয় নৃপতিরই প্রেমাস্পদ হইয়া উচ্চপদবীতে অধিরূঢ় হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি মীমাংসাদর্শনানুসারে ঐ স্থানে এমন মীমাংসা করে, যে শ্রুতি বা স্মৃতি কাহারই অবমাননা না হয়, উভয়েরই মান্যতা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি প্রধান পণ্ডিতপদবীতে পদার্পণ পূর্ব্বক জগন্মণ্ডলীতে বিখ্যাত হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। ঐ মীমাংসা এই, যেমন সরস্বতী দেবীর কেশাদি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও অধিকাংশ শুক্লবর্ণ বলিয়া "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী" অর্থাৎ সরস্বতী সর্ব্বতোভাবে শুভ্র ইত্যাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, সেইরূপ প্রকৃত স্থলে শ্রুত্যুক্ত স্পর্শ যোগ্যস্থানমাত্র পরিত্যাগ করিয়া উড়ুম্বরীর অন্য সকল অংশ বেষ্টন করিলেও স্মৃত্যুক্ত সর্ব্বতোভাবে বেষ্টনের কোন হানি হয় না, যেহেতু "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী" ইত্যাদি স্থলে সর্ব্ব শব্দে যেমন কেশাদি ভিন্ন সকলাংশ বলিতে হয়, সেইরূপ এ স্থলেও স্পর্শযোগ্য অংশ ভিন্ন তাবৎ অংশ সর্ব্বশব্দের তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। অতএব যাঁহারা শ্রুতি বা স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় করিতে সমুৎসুক হইবেন, তাঁহাদিগের যে মীমাংসাদর্শন অবশ্য পাঠ্য তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দর্শন এতদ্দেশে এককালে

লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, ঐ দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদির কথা দূরে থাকুক, পুস্তক পাওয়াও সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক পুনরায় যেরূপে ঐ দর্শনের আলোচনা হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা উত্তরকালে আর শাস্ত্র সকলের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় হইবে না। এই দর্শনে অনেক অধিকরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক একটী বিষয়ের এক একটী সিদ্ধান্তকে অধিকরণ কহে। যথা পূর্ব্বোক্ত ঔড়ুম্বরীস্পর্শস্থলীয় মীমাংসাকে বিরোধাধিকরণ কহে। এক স্থলের অধিকরণ অনুসারে তৎসম অনেক স্থানের সিদ্ধান্ত করা যায়। অধিকরণকে ন্যায়ও কহে, যেমন পূর্ব্বোক্ত পাদগ্রহণস্থলীয় সিদ্ধান্তকে নদিন্যায় কহে। অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ অধিকরণের পাঁচটী অঙ্গ আছে। যথা বিষয়, বিশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর আর সঙ্গতি। যাহার উপলক্ষে বিচার হয় তাহাকে বিষয় কহে। এবং তদ্বিষয়ে সংশয়কে বিশয়' অসৎপক্ষাবলম্বনকে পূর্ব্বপক্ষ, বাদিমত নিরাসকে উত্তর, ও তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয়কে সঙ্গতী কহে *। যথা পূর্ব্বোক্ত ঔড়ুম্বরী স্পর্শাদি বিধিকে বিষয় কহে, ও তদ্বিষয়ে যে, ঔড়ুম্বরী স্পর্শ করা কর্ত্তব্য, কি বেষ্টন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি সংশয় তাহাকে বিশয়, শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধাপাদনকে পূর্ব্বপক্ষ, আপাততঃ ঐ পূর্ব্বপক্ষ নিরাসকে উত্তর আর পূর্ব্ব প্রদর্শিত মীমাংসাকে সঙ্গতি কহে। দেবগণ শরীরী বা সচেতন নহে,

---

* ছলাদি দ্বারাও বাদিমত নিরাস করা যাইতে পারে, অতএব বাদিমত নিরাস রূপ উত্তরের দ্বারা বেদার্থের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় হয় না বলিয়া সঙ্গতির অপেক্ষা করে, এই সঙ্গতিকেই নির্ণয় কহে।

যে দেবের যে মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই দেব সেই মন্ত্র স্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই, বরং তদ্বিরোধী প্রমাণই বহুতর আছে। দেখ যদি মন্ত্র ভিন্ন এক জন শরীরী দেবতা থাকেন, সেই দেবতারই পূজা করা যায় এবং তিনিই আবহনাদি দ্বারা করুণা পূর্ব্বক ঘট ও প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে ঘটে কি মৃণ্ময় প্রতিমাদিতে, ইন্দ্রদেব আবাহিত হয়েন, সে ঘট কিম্বা মৃণ্ময় প্রতিমাদি ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের ভার বহনে অসক্ত হইয়া চূর্ণায়মান হইয়া যাইত সন্দেহ নাই, আর কি প্রকারেই বা অল্প পরিমিত ঘটে তাদৃশ বৃহদাকার ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের সমাবেশ সম্ভবে, কিন্তু দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিলে ঐ প্রকার দোষ ঘটে না। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত নহে এবং নিত্য। বেদ যদি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃতই হইত, তাহা হইলে কখনই বেদোক্ত যাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না, কোন অংশ অবশ্যই মিথ্যা হইত সন্দেহ নাই, কারণ এমন কোন ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হয় না যাহার কোন বিষয়ে কোন অংশে ভ্রান্তি না জন্মে, প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণেরও অতি স্থূল বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে, অতএব সকল ব্যক্তিই ভ্রান্ত, ভ্রান্ত ব্যক্তির কোন কথা কাকতালীয়ন্যায় কোন অংশে সত্য হইলেও কখনই সর্ব্বাংশে সত্য হয় না, এবং ভ্রান্ত ব্যক্তির কথাতেই বা কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস ও সমাদর করে? কিন্তু যখন বিশিষ্ট জনগণ বেদোক্ত বিষয়ের সর্ব্বাংশে সত্যতা ও শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমধিক বিশ্বাস পুরঃসর তদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন-

তখন বেদ যে নিত্য ও নির্দ্দোষ তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি।

এ স্থানে নৈয়ায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কহেন, বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে এমন কি নিয়ম আছে, ঘট কুম্ভকার কর্ত্তৃক কৃত এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্রান্ত পুরুষোক্ততা আছে, সেইরূপ বেদ অভ্রান্তপুরুষ প্রণীত এই মাত্র, নতুবা বেদ যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে এমন নয়। যদি অর্থের সত্যতা থাকিলেই বাক্য নিত্য হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘট কুম্ভকার কর্ত্তৃক কৃত, এই আধুনিক বাক্যও নিত্য হইয়া উঠে। যদিও এমন অভ্রান্ত পুরুষ সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু যে তাদৃশ অভ্রান্ত পুরুষ নাই এ কথাও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বকল্যাণাকর করুণাসিন্ধু পরাৎপর পরমেশ্বর বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই সর্ব্ব সাধারণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বেদ রচনার তাৎপর্য্য এই সর্ব্বসাধারণ জনগণ স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্যাদির অনুবর্ত্তী হইয়া বেদোক্ত এক একটী মার্গ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অভি-লষণীয় পদবীতে অধিরূঢ় হউক এবং অসন্মার্গে পদার্পণ করিয়া ঘোরতর ক্লেশকর নরক পুরীর অভিমুখে আর কেহ যাত্রা না করুক সকলেই ঐ মার্গ অবলম্বনে দোষ দর্শন করিয়া ঐ মার্গ একক্কালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্মার্গের শরণাগত হউক।

নৈয়ায়িক মহাশয়েরা এইরূপ অনেক সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া বেদের ঈশ্বরনির্ম্মিতত্ব প্রতিপাদন করেন, কিন্তু এ দিকে

পরমেশ্বরের শরীরাদি কিছুই স্বীকার করেন না, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যদি পরমেশ্বরের শরীরাদিই নাই তবে তিনি বেদ রচনা করিলেন কিরূপে, যে কোন বিষয় রচনা করিতে হইলে অন্ততঃ বর্ণ প্রয়োগাদিরও অপেক্ষা করে, বর্ণপ্রয়োগাদি যে, শরীরৈকদেশ কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির সংযোগ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই সম্ভবে না, ইহা ঐ নৈয়ায়িক মহাশয়েরাই শিক্ষা করিয়াছেন, বোধ হয়, নৈয়ায়িক মহাশয়েরা জিগীষা পরবশ হইয়া স্বমতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও বাদিজয়ার্থে আপাততঃ বেদের ঈশ্বরনির্ম্মিতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন নতুবা তাদৃশ সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মহাশয়দিগের ভ্রম হইয়াছে বলিলে সকলেই খড়্গাহস্ত হইবেন। যাহাহউক নৈয়ায়িক মহাশয়দিগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি, যেহেতু বিচারমল্ল উক্ত মহাশয়েরা স্বমত সংস্থাপনে ও পরমত খণ্ডনে এরূপ ব্যগ্র ও সাহসী যে স্বহস্ত নির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা নিজ শিরচ্ছেদন করিলেও কবন্ধের-ন্যায় বাগ্‌যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়েন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করেন। ফলতঃ প্রকৃত স্থলে একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা অবলম্বন করিয়া যে কত প্রকার কল্পনা করেন তাহা স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতী লেখনী ধারণ করিলে পরিগণনা করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

পাণিনি দর্শন।

এই দর্শন ভগবান্ পাণিনি মুনির প্রণীত, ইহাতে কি বেদস্থ কি লৌকিক-সকল সংস্কৃত শব্দই সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে,

এমত সংস্কৃত শব্দ প্রায় দৃষ্ট হয় না, যাহার সহিত পাণিনিদর্শনের সম্পর্ক নাই; ফলতঃ যেমত সংস্কৃত শব্দ হউক সকলই পাণিনি দর্শন অনুসন্ধান করিলে এক প্রকার সাধিত, ও ব্যুৎপাদিত হইতে পারে, অধুনা পাণিনি দর্শনের সদৃশ সকল পদ সাধন বিষয়ে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। যদিও মুগ্ধবোধ প্রভৃতি অন্যান্য আধুনিক ব্যাকরণ দ্বারাও কতকগুলি পদ সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল ব্যাকরণ দ্বারা বেদ ব্যাখ্যা করণেচ্ছু ধার্ম্মিক জনগণের সম্পূর্ণ উপকার দর্শে না, যেহেতু আধুনিক ব্যাকরণ-রচনাকর্ত্তারা বৈদিক শব্দ সাধনের উপায়স্বরূপ আর স্বতন্ত্র সূত্রাদি রচনা করেন নাই, কিন্তু তাহাতে এমত বিবেচনা করিও না যে আধুনিক ব্যাকরণকর্ত্তা মহোদয়গণের বৈদিক শব্দ সম্পর্কীয় সূত্রাদি সম্পাদনের সম্পূর্ণ শক্তি ছিল না, কারণ যেমন যে ব্যক্তির বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি সমাকীর্ণ পর্ব্বতোত্তোলনে সামর্থ থাকে, সে ব্যক্তি অনায়াসেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিও উত্তোলন করিতে পারে; সেইরূপ যে ব্যক্তি ব্যাকরণ রচনা করিতে পারে, তাহার পক্ষে বৈদিক শব্দ সম্পর্কীয় সূত্রাদি রচনা অতি সহজ, তবে যে ঐ মহোদয়গণ ঐ বিষয়ের সূত্রাদি রচনা করেন নাই তাহার তাৎপর্য্য, এই আধুনিক ব্যাকরণ সকল কেবল বালকদিগের আপাততঃ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির নিমিত্ত বিরচিত হইয়াছে এতদ্ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং যেরূপে বালকগণের ঝটিতি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে তদ্রূপে বিরচিত হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়, তাহাতে আর বৈদিক শব্দ সাধনের আবশ্যক কি, বরং তাহা রচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক গ্রন্থ বিস্তারাদি দোষ ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা,

অতএব আধুনিক ব্যাকরণকর্ত্তা মহোদয়গণের এতাদৃশ গূঢ়াভিসন্ধি অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কোন অনুযোগ করা যে অকর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। সে যাহাহউক যখন এই দর্শনে সংস্কৃত শব্দ সকল সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে তখন এই দর্শনের যে শব্দানুশাসন ও ব্যাকরণ, এই দুইটী নাম সুসঙ্গত হইতেছে, তাহা আর বলা বাহুল্য। ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রধান বেদাঙ্গ, অর্থাৎ বেদের যে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দোগ্রন্থ ও জ্যোতিষ ভেদে ছয়টী অঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান অঙ্গ, ব্যাকরণ, যেমন, যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের প্রধান অঙ্গের নিষ্পত্তি হইলে অন্যান্য গুণীভূত অঙ্গের অনুষ্ঠান জন্য স্বর্গাদিস্বরূপ প্রকৃত ফলের কোন হানি হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়নে অশক্ত হইয়া বেদাঙ্গের প্রাধানীভুত ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাহারও ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়ন জন্য প্রকৃত ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না। এজন্য সকল ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য ও হিতকর যে ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ তাহা সিদ্ধ হইল। ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে, সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে নানা উপকার দর্শে—বেদাদি শাস্ত্রের রক্ষা হয়, এবং সাধুশব্দপ্রয়োগাদি দ্বারা জনসমাজে অসীম সুখ্যাতি, অসামান্য মান্যতা, অসংখ্য সম্পত্তি ও অসদৃশ বিদ্যানন্দ ভোগ করিয়া অন্তে সংসার যাত্রা সম্বরণ পুরঃসর স্বর্গধামে অধিবাস হয়, ইহা অপেক্ষা সংসারী ব্যক্তির অভিলাষণীয় আর কি আছে।

শব্দ দুই প্রকার; নিত্য আর অনিত্য। নিত্যশব্দ একমাত্র স্ফোট, তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক

যে একটী নিত্যশব্দ আছে, তদ্বিষয়ে অনেক গ্রন্থে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দদ্বারা অর্থবোধ হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন-অকার, গকার, নকার ও ইকার এই চারিটী বর্ণস্বরূপ যে অগ্নিশব্দ তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল ঐ চারিটী বর্ণদ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, কারণ যদি ঐ চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণদ্বারা বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিম্বা গকার উচ্চারণ করিলেও বহ্নির বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটী বর্ণ একত্রিত হইয়া বহ্নির বোধ জন্মিয়া দেয়, এই কথা বলাও বালকতা প্রকাশ মাত্র, যেহেতু বর্ণ সকল আশুবিনাশী, পর পর বর্ণের উৎপত্তি কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অর্থ বোধের কথা দূরে থাকুক তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। অতএব বলিতে হইবে ঐ চারিটী বর্ণদ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোটদ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

এস্থলে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণদ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণদ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে, এবং সমুদায় বর্ণদ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সেই দোষ ঘটে। অতএব উভয় পক্ষেই এদোষ প্রসক্ত আছে তবে স্ফোটস্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার সিদ্ধান্ত এই, যেমন একবার পাঠদ্বারাই পাঠগ্রন্থের তাৎপর্য্যানুসারে অবধারিত হয় না, কিন্তু বারম্বার আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়,

সেইরূপ প্রথমবর্ণ অকারদ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্ফুটতা জন্মে না, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণদ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বস্তুর বোধক হয়, নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থবোধক হয় এমত নহে। যেমন নীল পীত ও রক্তাদি বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ এক স্ফোটিক মণিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্ত রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ স্ফোট একমাত্র হইলেও ঘট ও পটাদি-রূপ বিভিন্ন বর্ণদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া ঘট ও পটাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হয়।

এই স্ফোটকেই শাব্দিকেরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিদ্যানিবৃত্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়. এজন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের ফল যে মুক্তি তাহাও প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যথা, ব্যাকরণ শাস্ত্র মুক্তির দ্বারস্বরূপ, বাঙ্মলাপহ চিকিৎসাতুল্য. এবং সকল বিদ্যার মধ্যে পবিত্র। অথবা এই ব্যাকরণ শাস্ত্র সিদ্ধি-সোপানের প্রথম পদার্পণস্থান (অর্থাৎ যাঁহার সিদ্ধ হইবার অভিলাষ আছে, তাঁহাকে প্রথমতঃ ব্যাকরণের উপাসনা করিতে হয়) এবং মোক্ষমার্গের মধ্যে সরল রাজবর্ত্ম স্বরূপ।

গৌতমদর্শন।

এই দর্শন প্রণেতার নাম মহর্ষি অক্ষপাদ ও গৌতম, এই নিমিত্ত ইহাকে অক্ষপাদ ও গৌতম দর্শন কহে। ইহাতে ন্যায় ও তর্কপদার্থ বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হওয়াতে ইহার ন্যায়শাস্ত্র

ও তর্কশাস্ত্র এই দুইটী নাম ও অন্বর্থ হইতেছে। এবং এই দর্শনে অনুমানের রীতি সবিশেষ নিরূপিত থাকায় ইহাকে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র বলিয়াও ব্যবহার করিয়া থাকে*। এই ন্যায় শাস্ত্রের সকল শাস্ত্রেই উপযোগিতা আছে, যেহেতু ন্যায়শাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেরই যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহ হয় না। ভগবান্ বৃহস্পতিও কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তর্কশাস্ত্রানুসারে তাৎপর্য্যার্থের অনুসন্ধান করে, সে ব্যক্তিই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মনির্ণয়ে সমর্থ হয়। কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম বিচার করা অকর্ত্তব্য যেহেতু ন্যায় স্বরূপ যুক্তিবিহীন বিচারে ধর্ম্ম হানি হয়"। পক্ষিলস্বামী কহিয়াছেন "এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ, যাবতীয় কর্ম্মের উপায় এবং নিখিল ধর্ম্মের আশ্রয়"। আর যখন মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মোপায়ে স্বয়ং বেদব্যাসেই লিখিয়াছেন "হে বৎস পার্থিব! আমি আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র অবলোকন করিয়া উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়াছি"। তখন ন্যায়মতানুসারী উপনিষদের অর্থই গ্রাহ্য শ্রদ্ধেয় ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। এ স্থলে অন্যাপথাবলম্বী কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, ন্যায়মতানুসারে কিরূপে উপনিষদের অর্থগ্রহণ করা যাইতে পারে, যেহেতু "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি অনেকানেক ন্যায়বিরুদ্ধ শ্রুতি আছে। কিন্তু আদ্যোপান্ত বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি দর্শন করিলে ঐ আপত্তি কেবল অবোধ বিলসিত বোধ হইবে, যেহেতু উক্ত গ্রন্থে

* অনু (শ্রবণাদনু) + ঈক্ষা (মননম্) = অন্বীক্ষা, তন্নির্ব্বাহিকা আন্বীক্ষিকী, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের শ্রবণানন্তর তাহার অনুমানরূপ মননের নির্ব্বাহক শাস্ত্র।

মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ঐ সকল সূত্র সমন্বয় করিয়াছেন। তাহা অবলোকন করিলে ন্যায়মতানুসারে প্রতার্থ সংগ্রহ করাই ন্যায্য বোধ হইবে।

গৌতম প্রণীত এই ন্যায়শাস্ত্র পঞ্চাধ্যা। ঐ পাঁচটীয়াত্মক অধ্যায়েই দুই দুইটী আহ্নিক আছে এবং সকল আহ্নিকই প্রকরণাত্মক। যদিও, কোন আহ্নিকে চারিটী, কোন আহ্নিকে আটটী, আর কোন আহ্নিকে বা তদধিক প্রকরণ থাকায় বিশেষরূপে প্রকরণের নিয়ম নাই বটে; কিন্তু কোন আহ্নিকেই চারিটীর ন্যূন আর সতরটীর অধিক প্রকরণ নাই এরূপ সামান্য নিয়ম আছে। প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে প্রমাণাদি নয়টী পদার্থের লক্ষণ এবং দ্বিতীয়াহ্নিকে বাদ হইতে নিগ্রহ স্থান পর্য্যন্ত সাতটী পদার্থের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ের প্রথমে সংশয় পরীক্ষা * এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়ের অপ্রামান্য শঙ্কানিরাকরণ। দ্বিতীয়ে অর্থাপত্তিপ্রমাণপ্রভৃতির অনুমানে অন্তর্ভাব; তৃতীয়ের প্রথমে আত্মপ্রভৃতি অর্থপর্য্যন্ত চারিটী প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা, দ্বিতীয়ে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা চতুর্থের প্রথমে প্রবৃত্তি অবধি অপবর্গপর্য্যন্ত ছয়টী প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা, দ্বিতীয়ে তত্ত্বজ্ঞান পরীক্ষা; পঞ্চমের প্রথমে জাতিপদার্থবিভাগ, দ্বিতীয়ে নিগ্রহস্থান বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে।

এই মতে পদার্থ ষোল প্রকার; প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়,

---

* কোন বিষয় স্বীকার করিতে যে যুক্তি উপন্যাস করা যায়, তাহাকে তাহার পরীক্ষা কহে। অতিরিক্ত সংশয় পদার্থ স্বীকার করিবার যুক্তিকে সংশয় পরীক্ষা কহে।

প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান।

যাহার দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের নির্ণয় করা যায় তাহাকে প্রমাণ পদার্থ কহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দভেদে প্রমাণ চারি প্রকার। ঐ চারিটী প্রমাণদ্বারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি আর শব্দবোধ—এই চারিটী প্রমিতি জন্মে। নয়নাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি কহে। প্রত্যক্ষ প্রমিতি ছয় প্রকার; ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রবণ ও মানস। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র আর মনঃ এই ছয়টী ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। গন্ধ, ও তদ্গত সুরভিত্ব ও অসুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হয়। মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, নীল পীতাদি রূপ, ঐ ঐ রূপ-বিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতি জাতি, ঐ ঐ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগ্যবৃত্তি সমবায়াদির চাক্ষুষ, উদ্ভূত শীত উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদির * ত্বাচ, শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব, ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখদুঃখাদি আত্ম-বৃত্তি গুণের, আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস প্রত্যক্ষ † হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়

* বল্লভাচার্য্যমতে গুরুত্বেরও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়। নব্যেরা বায়ু ও তদ্গত কোন কোন সংখ্যার স্পার্শন প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া থাকেন।

† বাচস্পতিমিশ্রমতে আত্মার পরিমাণ ও একত্ব সংখ্যার মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

তাহাকে অনুমিতি কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে তাহাকে তাহার ব্যাপ্য, এবং যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে; যথা কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এবং যে স্থানে ধূম থাকে সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এইজন্য লোকে পর্ব্বতাদিতে ধূম সন্দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান করিয়া থাকে। অনুমান ত্রিবিধ, পূর্ব্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ দর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ "কারণলিঙ্গক" অনুমান কহে, যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ "কার্য্য লিঙ্গক" অনুমান কহে, যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কারণ ও কার্য্যভিন্ন কেবল ব্যাপ্য যে বস্তু তাহাকে দর্শন করিয়া যে অনুমিতি হয় তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শশধর সন্দর্শনে শুক্লপক্ষের অনুমান ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্ব জাতির অনুমান।

কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তি পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে। যথা, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গবয় জন্তু সন্দর্শন করে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে, গো সদৃশ গবয়পদবাচ্য, অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গোর আকৃতিতুল্য, গবয় শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে এই মাত্র জানে, যে, যে জন্তু গো সদৃশ হইবে গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে, গবয় শব্দ দ্বারা গবয় জন্তু বুঝায় জানে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির

নয়ন পথে গবয় জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গোর আকৃতিতুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বশ্রুত গোসদৃশ গবয় পদবাচ্য এই বাক্যের স্মরণ করিয়া বিবেচনা করে, যদি গোসদৃশ জন্তুকে গবয়শব্দে বুঝায়, তবে যখন এই জন্তুটী গোদৃশ হইতেছে, তখন এই জন্তুই গবয় পদবাচ্য হইবে সন্দেহ নাই। এ স্থলে "এই জন্তুই গবয় পদবাচ্য হইবে" এইরূপ গবয় শব্দের শক্তি পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে।

শব্দ দ্বারা যে বোধ হয় তাহাকে শব্দবোধ কহে। যেমন গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছাত্রগণের উপদিষ্ট অর্থের শব্দবোধ জন্মে। শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ; দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাকে দৃষ্টার্থক, আর যাহার অর্থ অদৃশ্য তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ কহে। ইহার উদাহরণ যথাক্রমে, তুমি গৌরবর্ণ, আমার পুস্তক অতি উত্তম, তুমি দেখ ইত্যাদি সিদ্ধার্থক বাক্য, আর যাগ করিলে স্বর্গ হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণু সন্তোষ জন্মে ইত্যাদি বিধি বাক্য।

প্রমেয় পদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গভেদে দ্বাদশ প্রকার। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার; বহিরিন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয়। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র ভেদে বহিরিন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। অন্তরিন্দ্রিয় এক মাত্র মনঃ। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দভেদে অর্থ পদার্থ পাঁচ প্রকার। দোষ পদার্থ রাগ, দ্বেষ ও মোহ ভেদে ত্রিবিধ। কাম, মাৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, মায়া ও দম্ভাদি ভেদে রাগ পদার্থ নানাবিধ। রমণেচ্ছাকে কাম কহে। নিজ প্রয়োজন ব্যতিরেকেই পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণ-

...হে, যেমন জলপানার্থ রাজকীয় পুষ্করিণীর ...দাদ্যত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উদাসীন ব্যক্তির নিবারণেচ্ছা। পরগুণের নিবারণেচ্ছাকেও মৎসর কহে। যে বিষয়ে কোন ধর্ম্মের হানি না হয় এমত বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছাকে স্পৃহা, আর আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে। কার্পণ্যাদিভেদে তৃষ্ণাও নানাবিধ। উচিত দান না করিয়া ধনরক্ষণেচ্ছাকে কার্পণ্য কহে। যাহার দ্বারা পাপ হইতে পারে এমত বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে লোভ কহে। পরবঞ্চনেচ্ছাকে মায়া কহে। ছলক্রমে নিজের ধার্ম্মিকত্বাদি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় উৎকৃষ্টত্ব ব্যবস্থাপনেচ্ছাকে দম্ভ কহে।

ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ও অভিমানাদি ভেদে দ্বেষও নানাপ্রকার। নেত্রাদির রক্তত্বাদিজনক দ্বেষকে ক্রোধ ও সাধারণ ধনাদি হইতে নিজাংশগ্রাহী এক অংশীর প্রতি অপর অংশীর যে দ্বেষ হয়, তাহাকে ঈর্ষ্যা কহে, যেমন দুরন্ত ও দায়ার্দ্রগণের পরস্পর দ্বেষ। পরগুণাদিতে যে বিদ্বেষ তাহাকে অসূয়া, প্রাণবিনাশজনক দ্বেষকে দ্রোহ, দুর্দ্দান্ত অপকারীর প্রতি প্রত্যপকারাসমর্থ ব্যক্তি দ্বেষকে অমর্ষ, এবং তাদৃশ অপকারীর অপকার করিতে না পারিয়া "ধিক্ আমার আর জীবন ধারণ করা বৃথা! যেহেতু আমার অপকারীর অপকার করিবার ক্ষমতা নাই" এইরূপ আত্মাবমাননাকে অভিমান কহে।

বিপর্য্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয়, শোকাদিভেদে মোহও নানাপ্রকার। অযথার্থ নিশ্চয়কে বিপর্য্যয় কহে,

যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া নিশ্চয় করা। যে যে গুণ বাস্তবিক নিজের নাই সেই সকল গুণ নিজে আরোপ করিয়া আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করাকে মান, এক বিষয়কে পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া ক্ষণকাল পরেই পুনরায় তাহাকে অকর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করাকে অর্থাৎ (মতির অস্থিরতাকে) প্রমাদ কহে। অনিষ্টজনক কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকারে নিজের অসামর্থ্যজ্ঞানকে ভয় আর ইষ্টবস্তুর বিয়োগ হইলে পুনরায় তাহার অপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে শোক কহে।

বারম্বার উৎপত্তিকে অর্থাৎ একবার মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনন্তর জন্মগ্রহণরূপ জন্মগ্রহণের আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে। যত দিন না মুক্তি হয় ততদিন সকল জীবগণকেই এই প্রেত্যভাব দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়।

যাহার দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহার ফল তাহাকে কহে, যেমন রন্ধনের ফল অন্ন, শাস্ত্রানুশীলনের ফল জ্ঞানোদয়। ফল পদার্থ মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। চরম ফলকে মুখ্যফল কহে. মুখ্যফল সুখ ও দুঃখের ভোগ। এতদতিরিক্ত সকল ফলই গৌণ ফল। যেহেতু সকল কর্ম্মেরই চরমে সুখ বা দুঃখের ভোগ স্বরূপ ফল পর্য্যবসন্ন হয়। দেখ, রন্ধন দ্বারা পরিশেষে ভোজন জন্য তৃপ্তিরূপ সুখ ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে অসীম বিদ্যানন্দরূপ সুখের ভোগ হয়; আর চৌর্য্যাদি দোষে দূষিত হইয়া পরিশেষে পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় কারাবদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা স্বরূপ দুঃখের ভোগ হয়; এইরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, সকল কর্ম্মেরই চরম ফল সুখভোগ কিম্বা দুঃখভোগ।

অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি রূপ মুক্তিকে অপবর্গ কহে। যে বিষয়ের উদ্দেশে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই বিষয়কে সেই ব্যক্তির সে বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রয়োজন কহে। যেমন বুভুক্ষু ব্যক্তির রন্ধন প্রয়োজন ভোজন এবং সূপকারের বেতন। এস্থলে এমন আশঙ্কা করিও না যে, ঐ ঐ ব্যক্তিদিগের ভোজন ও বেতন গ্রহণাদি যেমন রন্ধনের প্রয়োজন হইতেছে সেরূপ রন্ধনের ফল স্বরূপও হইতেছে, তবে প্রয়োজন পদার্থ ও ফল পদার্থ পৃথক নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন কি? যেহেতু এস্থলে ঐ উভয় পদার্থের ঐক্য থাকিলেও কুপিত ফণিফণাস্থ মণির আশয়ে ফণায় হস্তক্ষেপাদির স্থলে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা আছে। ঐ স্থলে মণির আশয়ে ফণায় হস্ত নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন মণি এবং ফল, সর্পকৃত দংশন দ্বারা প্রাণ বিয়োগ। যে হেতু যে বিষয়ের আশয়ে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক তাহাকে প্রয়োজন, আর অভিপ্রেত হউক বা অনভিপ্রেতই হউক যে বিষয় যাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে তাহার ফল কহে ইহা পূর্ব্বে প্রায় উক্তই হইয়াছে।

প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। অভিলাষণীয় বিষয়ান্তরের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলাষণীয় হয় তাহাকে গৌণ, আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলাষণীও বিষয়কে মুখ্য প্রয়োজন কহে। মুখ্য প্রয়োজন সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি, ঐ সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির সম্পাদক বলিয়াই অতি ক্লেশকর বিষয়ও প্রার্থনীয় হয়। দেখ যদি ধনাদি দ্বারা ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও যজ্ঞাদির দ্বার পারলৌকিক

স্বর্গাদি লাভ না হইত, তবে কোন ব্যক্তিই শারীরিক [illegible] স্বীকার করিয়া ধনোপার্জ্জন ও যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হ[illegible] অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ঐ সুখ-লাভের আশয়েই ঐ ঐ বিষয়ে লোকে প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি ঔষধ সেবন করিলেও শারীরিক পীড়া নিবৃত্ত না হইত অথবা যোগাভ্যাস করিলেও মুক্তি না হইত, তবে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুষ্ট দুঃখজনক ঐ ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইত? কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি জানে ঔষধ পান করিলে পীড়া শান্তি হয় অথবা যোগাভ্যাস করিলে মুক্তি হয়, সেই ব্যক্তিই ঐ ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, আর যে ব্যক্তি তাহা না জানে কিম্বা তদ্বিষয়ে তাহার বিশ্বাস না জন্মে, সেই ব্যক্তি ঐ ঐ বিষয়ে কদাচ প্রবৃত্ত হয় না; * তখন ঔষধ পান ও যোগাভ্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য যে অনুক্রমে পীড়া শান্তিরূপ শারীরিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও মুক্তিস্বরূপ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি তাহার আর সন্দেহ কি। ফলতঃ সকল বিষয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি বলিয়া সুখ ও দুঃখনিবৃত্তিকে মুখ্য প্রয়োজন আর উহাদিগের সাধন বলিয়া ধনোপার্জ্জনাদিকে গৌণ প্রয়োজন কহে।

প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপন্যাস করা যায়, সেই স্থলকে দৃষ্টান্ত কহে। যথা "এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, যে যে স্থলে ধূম থাকে সেই সেই স্থলেই বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালা" এ স্থানে "যেমন রন্ধনশালা" এই অংশটীকে দৃষ্টান্ত কহে।

অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত

* ইহার উদাহারণ যথাক্রমে বালক ও নাস্তিকগণ।

[illegible] মুক্তি হয় এইরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত [illegible]শ্রেয়সাধিগমঃ” ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি হয় এইরূপ নিশ্চয় করা। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার; সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ আর অভ্যুপগম। যে বিষয় সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে এমত বিষয়ের স্বীকারকে সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত কহে, যেমন পরধনাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ ও পরের দ্বেষ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য আর দীনের প্রতি দয়া, পরগুণে সন্তোষ ও পরোপকার প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সর্ব্বদা করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি স্বীকার করা। যে বিষয় শাস্ত্রান্তর সম্মত নহে, এতদ্বিষয়ের স্বকীয় শাস্ত্রে স্বীকারকে প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত কহে; যথা বৈশেষিকদর্শনকর্ত্তার বিশেষ পদার্থ স্বীকার। এক বিষয় স্বীকার করিলে যে, বিষয়ান্তরেরও স্বীকার করা হয় তাহাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত কহে; যথা জগৎ ঈশ্বর নির্ম্মিত বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের যে জগন্নির্ম্মাণ ক্ষমতা আছে তাহাও স্বীকার করা হয়, এবং এই কাষ্ঠখানি একশত লোকেও উত্তোলন করিতে পারে না ইহা অঙ্গীকার করিলে ইহাও অঙ্গীকার করা হয় যে এই কাষ্ঠের অতিশয় গুরুতা আছে। কোন বিষয় স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ না করিয়া প্রকারান্তরে সে বিষয়ের স্বীকারকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত কহে; যথা ঈশ্বর আছেন কি না তাহার কিছু মাত্র উল্লেখ না করিয়া এই জগৎ ঈশ্বর নির্ম্মিত ইত্যাদি কথন দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করা এবং এই ন্যায়সূত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ইন্দ্রিয়গণনাস্থলে উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু স্থলান্তরে মহর্ষি গোতমের মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ভঙ্গিক্রমে স্বীকার করা হইয়াছে।

বিচারাঙ্গ বাক্য বিশেষকে অবয়ব কহে। অবয়ব পাঁচটী; প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। যে বিষয়ের ব্যবস্থাপন করিতে হইবে তাহার উপন্যাসকে প্রতিজ্ঞা কহে। যথা পর্ব্বতে বহ্নির সাধনার্থ "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" অর্থাৎ অগ্নি আছে ইত্যাদি বাক্য। কি হেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে এই জিজ্ঞাসা নিরাসার্থ তদনুমাপক হেতুর যে উপন্যাস তাহাকে হেতু কহে; যেমন ঐ স্থলেই "ধূমাৎ" অর্থাৎ ধূম হেতু এই ভাগের উপন্যাস। উদাহরণ দ্বিবিধ অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। পর্ব্বতে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে কেন? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ "যো যো ধূমবান্ সঃ স বহ্নিমান" অর্থাৎ যে যে স্থানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানেই বহ্নি থাকে, যথা রন্ধনশালা, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগকে অন্বয়ী উদাহরণ, আর পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাকরণার্থ "যন্নৈবং তন্নৈবং" অর্থাৎ যে স্থানে বহ্নি না থাকে সে স্থানে ধূমও থাকে না যথা পুষ্করিণী ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগকে ব্যতিরেকী উদাহরণ কহে। সকল স্থানে উদাহরণ দ্বয়ের উপন্যাস করার আবশ্যকতা নাই যেহেতু একতরের উপন্যাস করিলেই পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিবারণ হইতে পারে। এই উদাহরণ বাক্য দ্বারা বহ্নিতে ধূমের নিয়ত সহচারিত রূপ ব্যাপকতা পক্ষনামক ব্যবস্থাপন করিয়া প্রকৃত স্থলে প্রকৃত সাধ্য সাধক হেতুর ব্যবস্থাপনকে উপনয় কহে, যথা "বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ং" অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপ্য ধূম এই পর্ব্বতে আছে, এইরূপ বাক্য। আর প্রকৃত পক্ষ প্রকৃতসাধ্যের উপসংহার বাক্যকে নিগমন কহে; যেমন "তস্মাৎ বহ্নিমান্" অর্থাৎ সেইহেতু এই পর্ব্বতের বহ্নি আছে ইত্যাদি বাক্য। যেমত হস্ত, পদ ও উদরাদির প্রত্যেককে

শরীরের অবয়ব আর তৎ সমুদায়কে শরীর কহে, সেইরূপ প্রতিজ্ঞাদি ঐ পাঁচটী বাক্যের প্রত্যেককে ন্যায়াবয়ব আর তৎসমুদায়কে ন্যায় বাক্য কহে। সকল বিচারস্থলেই ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়, ন্যায় প্রয়োগ না করিলে কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্য ন্যায়ের অবয়ব বলিয়াই উহাদিগকে অবয়ব কহে।

আপত্তি বিশেষকে তর্ক কহে; যথা "যদায়ং মনুষ্যঃস্যাৎ করচরণাদিমান্ স্যাৎ" অর্থাৎ যদি ইহা মনুষ্য হইত, তবে অবশ্য ইহার হস্ত পদাদি থাকিত, ইত্যাদি আপত্তি। তর্ক পাঁচ প্রকার; আত্মাশ্রয়, অন্যান্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও প্রমাণবাধিতার্থ প্রসঙ্গ।

পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর বিচারকে বিচারকে বাদ কহে। ঐ বাদ বিচারে সকলে অধিকারী নহে। যাহারা প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু, যথার্থবাদী, বঞ্চকতাদি দোষশূন্য, যথাকালে প্রকৃতোপযোগী কথন সমর্থ সিদ্ধান্ত বিষয়ের অপলাপ করে না এবং যুক্তিসিদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারাই বাদবিচারে অধিকারী। প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়াংশে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল জিগীষাক্রমে পরমত খণ্ডন ও স্বমত ব্যবস্থাপনার্থ যে বাদী প্রতিবাদীর বাগাড়ম্বর, তাহাকে জল্প কহে। স্বমত স্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ যে বাগ্জালারম্ভ, তাহাকে বিতণ্ডা কহে। এই দুই বিচারের অধিকারী সকলেই হইতে পারেন। বিচারের রীতি এইরূপ প্রথমতঃ বাদীকে স্বমত সংস্থাপন করিয়া স্বমতে যে যে দোষ

সম্বন্ধে তাঁহার নিরাকারণ করিতে হয়, পরে প্রতিবাদীকে বাদী কর্তৃক সংস্থাপিত বিষয়ে নিজ অবোধ নিরাসার্থ ঐ বিষয়ের অনুবাদ করিয়া তাহাতে দোষারোপণ পূর্ব্বক স্বমত ব্যবস্থাপন করিতে হয়, পুনর্ব্বার বাদীকে প্রতিবাদীকথিত বিষয়ে নিজ অবোধ নিরাসার্থ ঐ বিষয়ের অনুবাদ করিয়া স্বমতে প্রতিবাদি-দত্ত দোষের উদ্ধার পূর্ব্বক প্রতিবাদিমতে দোষের উদ্ভাবন করিতে হয়. এবং পূনর্ব্বার প্রতিবাদীকেও এইরূপ করিতে হয়। এই রীতিক্রমে বিচার করিতে করিতে যিনি স্বমতে দোষোদ্ধারে বা পরমতে দোষ দানে অসমর্থ হয়েন তিনিই পরাজিত হয়েন। এবং এই রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন বা অযথাকালে অর্থাৎ দোষোদ্ভাবনাদির অসময়ে দোষ দানাদিতে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারও পরাজয় হয়।

প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয়, তাহাকে হেত্বাভাস কহে, যথা "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" অর্থাৎ পর্ব্বতে ধূম আছে যে হেতু বহ্নি আছে, ইত্যাদি স্থলে বহ্নিরূপ হেতু। যে হেতু বহ্নি বাস্তবিক ধূমের সাধক নহে, কারণ যে পদার্থ যাহার ব্যাপ্য না হয় সে পদার্থ তাহার সাধক হয় না এইরূপ নিয়ম আছে; বহ্নি ধূম ব্যতিরেকেও দগ্ধ লৌহ ও শুষ্ক তৃণাদিতে থাকে বলিয়া ধূমের ব্যাপ্য নহে, সুতরাং কি প্রকারে ধূমের সাধক হইবেক। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার; সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষিত আর বাধিত।

বক্তা যে অর্থতাৎপর্য্যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক মিথ্যা

যে দোষারোপ করা, তাহাকে ছল কহে; যথা "হরিপ্রসাদ-মহং ভক্ষয়ামি" অর্থাৎ হরির প্রসাদ আমি ভক্ষণ করিতেছি ইত্যাদি স্থলে হরি শব্দের বিষ্ণুরূপ তাৎপর্য্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া বানররূপ অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক,! তুমি বানরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর, যাও তুমি বড় ম্লেচ্ছ, তোমার সহিত আর আহার ব্যবহার করিব না, ইত্যাদি দোষারোপ করা। বাক্‌ছল সামান্য ছল ও উপচার ছল ভেদে ছল পদার্থ তিন প্রকার। অসদুত্তরকে অর্থাৎ বাদিকর্ত্তৃক সংস্থাপিত মত দূষণে অসমর্থ অথবা নিজমতের হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি কহে। জাতি পদার্থ চব্বিশ প্রকার; সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম, অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, অপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অনুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, অহেতুসম, অর্থাপত্তিসম, অবিশেষসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অনুপ-লব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম আর কার্য্যসম।

প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষার্পণ করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদিরূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। নিগ্রহস্থান বাইশ প্রকার; প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনু-যোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত আর হেত্বা-ভাস।

এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে অর্থাৎ এই ষোলটী

পদার্থ বিশেষরূপে জানিতে পারিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ আত্মা যে শরীরাদি হইতে পৃথক্‌ভূত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সুতরাং শরীরাদিতে আত্মত্ববুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মে না। এইরূপে রাগ ও দ্বেষের কারণ স্বরূপ ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে রাগ ও দ্বেষের আর উৎপত্তি হয় না, যদি রাগ ও দ্বেষই নিবৃত্ত হইল, তবে উহারদিগের কার্য্য স্বরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির পুনর্ব্বার উৎপত্তির সম্ভাবনা কি? আর যখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই জন্মগ্রহণের মূল ভূত হইতেছে, তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে যে, জন্মাদিও নিবৃত্ত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা কি। আর যেমন কোন আশ্রয় ব্যতীত অস্মদাদির গমনাগমনাদি হয় না, সেরূপ সুখ ও দুঃখের আয়তন স্বরূপ শরীরাদির অভাবে তত্ত্বজ্ঞানীর মরণানন্তর আর সুখ বা দুঃখ কিছুই জন্মে না, সুখ ও দুঃখ এক কালেই নিবৃত্ত হইয়া যায়; ঐ দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে।

জীবাত্মাতিরিক্ত এক জন যে পরমেশ্বর আছেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ অনুমান ও শ্রুত্যাদি। অনুমান প্রণালী এইরূপ। যে যে বস্তু কার্য্য হয়, তাহার একজন কর্ত্তা থাকে, যেমন ঘট ও পটাদি কার্য্যের কর্ত্তা যথাক্রমে কুম্ভকার ও তন্তুবায়াদি। এইরূপ অগম্য অরণ্যস্থ বৃক্ষাদিও কার্য্য বটে, তাহারও এক জন কর্ত্তা আছে বলিতে হইবে; কিন্তু তদ্বিষয়ে অস্মদাদির কর্তৃত্ব সম্ভবে না, যেহেতু তাদৃশ স্থান অস্মদাদির অগম্য, সুতরাং তৎস্থানস্থিত স্থাবরাদির কর্ত্তা যে এক জন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর আছেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পরমেশ্বরের ভোগসাধন শরীর, সুখ দুঃখ, ও দ্বেষাদি কিছুই নাই, কেবল

নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কএকটী গুণ আছে। জীবাত্মা নানা অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ এক একটী জীবাত্মা আছে। যদি সকলেরই আত্মা এক হইত তবে এক জনের সুখে বা দুঃখে জগৎ সুখী বা দুঃখী হইত; যেহেতু সুখ ও দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম, এক ব্যক্তির আত্মাতে সুখ ও দুঃখাদির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অসদ্ভাব থাকিত না। কিন্তু এই দোষ নিবারণ করিতে নয়নাদি স্বরূপ ইন্দ্রিয়কে যে আত্মা বলা তাহাও ভ্রান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে; কারণ যদি নয়নাদি স্বরূপই আত্মা হইত, তবে আমি চক্ষু ইত্যাদি ব্যবহার হইত, ও নয়নাদির বিনাশ হইলে আত্মারও বিনাশ হইত, এবং যেমন অন্য ব্যক্তির দৃষ্ট বস্তু অপর ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে পূর্ব্ব দৃষ্ট পদার্থ সকলের স্মরণ হইত না; যেহেতু ঐ পদার্থদ্রষ্টা চক্ষুঃ বিনষ্ট হইয়াছে সুতরাং চক্ষু কর্ত্তৃক দৃষ্ট পদার্থ আর কোন্ ব্যক্তি স্মরণ করিবে?

এবং "আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থূল বা আমি কৃশ" ইত্যাদি ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শরীরকে আত্মা বলিয়া যে স্বীকার করা তাহাও স্থূলদর্শিতার কর্ম্ম বলিতে হইবে, কারণ যদি শরীরই আত্মা হইত তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করিত না, যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও বিনষ্ট হইত সুতরাং আর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গ বা নরকভোগ করিবে। স্বর্গ বা নরকাদি অলীক বলিয়াই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া

যাগাদি করিত না এবং পরদার গমনাদিরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্ত হইত না, বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আরও দেখ যদি শরীরই আত্মা হইত তবে সদ্যপ্রসূত বালকের হর্ষ, শোক ও ভয়াদি বা স্তনপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না, কারণ তৎকালে ঐ বালকের হর্ষাদির কোন কারণ নাই এবং স্তন পান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহাও জানে না ও উপদিষ্টও হয় না; কিন্তু ইহলোক ও পরলোকগামী সুখদুঃখাদিভোক্তা, নিত্য এক অতিরিক্ত আত্মপদার্থ স্বীকার করিলে আর এ দোষ ঘটে না, যেহেতু ঐ বালকের পূর্ব্বানুভূত হর্ষাদির কারণের স্মৃতি হইয়াই হর্ষাদি হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বানুভূত স্তনপানের সংস্কার বশতঃই তৎকালে স্তনপানে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি গৌর ইত্যাদি যে, শরীরাভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা ভ্রমাধীন বলিতে হইবে।

ইতি ষড় দর্শন সংগ্রহ সম্পূর্ণ।

Printed by B. L. Dass
At the "NEW CALCUTTA PRESS"
No. 3 Beadon Square, Calcutta.